Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব, ফজিলত, প্রয়োজনীয় মাসআলা, মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাইমা তুজ যোহরা

রোলঃ 23090121156

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব, ফজিলত, প্রয়োজনীয় মাসআলা, মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাইমা তুজ যোহরা

রোলঃ 23090121156

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজার গুরুত্ব, ফজিলত, প্রয়োজনীয় মাসআলা, মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাইমা তুজ যোহরা, আইডিঃ 23090121156 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব, ফজিলত, প্রয়োজনীয় মাসআলা, মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাইমা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফাইমা তুজ যোহরা

আইডিঃ 23090121156

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

রোজার পরিচয় 6

রোজার প্রকারভেদ: 7

রোজার হুকুম: 7

রোজার ইতিহাস 8

রমজান মাসের বৈশিষ্ট্য 14

কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত: 17

রোজার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুরুত্ব 36

রোজার সামাজিক গুরুত্ব 38

রোজার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা ও গুরুত্ব 41

রমজান মাসের আমল 46

রমজান মাসের বর্জনীয় কাজ 57

অন্যান্য নফল রোজার ফজিলত 61

রোজার প্রয়োজনীয় মাসআলা ও মাসায়েল 70

চাঁদ সংক্রান্ত মাসআলা 71

সাহরী 76

ইফতার 78

কাফফারা-সংক্রান্ত মাসায়েল 80

রোজার কাযা-সংক্রান্ত মাসায়েল 84

যাদের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে 95

রমযান ও রোজার ক্ষেত্রে হায়েয-নেফাস সংশ্লিষ্ট মাসআলা 99

ফিদইয়া 100

রোজার আধুনিক মাসায়েল 103

উপসংহার 113
তথ্যসূত্র 114

ভূমিকা

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম হলো রোজা। ঈমান, নামাজ ও যাকাতের পরেই রোজার স্থান। ফরজ ইবাদত হিসেবে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম।আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।” (সূরা বাকারা: ১৮৩)

রোজা কেবলমাত্র একটি খাদ্য এবং পানীয় বর্জনের আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং এর লক্ষ্য হল তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করা এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা।

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, "রোজা আমারই জন্য, আর আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব" (সহীহ বুখারী, হাদিস ১৯০৪)। এই বিশেষ মর্যাদা রোজাকে অন্যান্য ইবাদত থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এটি মুমিনের জন্য গুনাহ মাফের এক সুবর্ণ সুযোগ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢালস্বরূপ।

রোজা হচ্ছে পাপাচার,মিথ্যাচার এবং খারাপ কাজ থেকেও দূরে রাখার প্রশিক্ষণ, যা উন্নত চরিত্র এবং একটি সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়তা করে।এছাড়া রোজা হজমশক্তিকে বিশ্রাম দেয় এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

বর্তমান বিশ্বে রোজা শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং সামাজিক, স্বাস্থ্যগত ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে রোজার মাসআলা ও মাসায়েল জানা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, যাতে তারা সঠিকভাবে ইবাদত করতে পারে।

এই গবেষণার মধ্যে সমস্ত মাসাআলা-মাসায়েল গুলো একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং রোজার আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত ফজিলত গুলো উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এই গবেষণাপত্রটি মুসলিম উম্মাহকে রোজার বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে এবং এই মহান ইবাদতটি যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে পালনে উৎসাহিত করবে ইনশাল্লাহ।

রোজার **পরিচয়**

"রোজা" শব্দটি ফারসি শব্দ, যার আরবি হলো "সাওম" (صوم) বা "সিয়াম" (صيام) । সাওম পালনকারীকে 'সায়েম' বলা হয়।

صوم এর আভিধানিক অর্থ:

শব্দগত দিক থেকে صوم এবং صيام উভয়টিই মাসদার।এর আভিধানিক অর্থ-১. الإمساك عن الفاعل তথা কাজ থেকে বিরত থাকা । ২. কঠোর সাধনা করা। ৩. অবিরাম প্রচেষ্টা। ৪.আত্মসংযম।

صوم এর পারিভাষিক সংজ্ঞা:

১. আবুল হোসাইন কুদূরী ও জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন-

الصوم إمساك مخصوص في زمان مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة

অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকার নাম صوم তথা রোজা।

২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন-

الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية

অর্থাৎ, সাওম হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহকারে পানাহার থেকে বিরত থাকা।

৩. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন-

الصوم هو ترك الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى غروب الشمس

অর্থাৎ, সাওম তথা রোজা হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

রোজার প্রকারভেদ:

রোজা মোট পাঁচ প্রকার:

১. ফরজ রোজা। যেমন- রমজানের রোজা।

২. ওয়াজিব রোজা। যেমন- মানতের রোজা, নির্দিষ্ট মানতের রোজা, সাধারণ মানতের রোজা, কাফফারার রোজা।

৩. সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা রোজা। যেমন- শবে বরাত ও আশুরার রোজা, ايام بيض এর রোজা।

৪. মাকরুহ রোজা।
যেমন- صوم وصال তথা লাগাতার রোজা।

৫. হারাম রোজা। যেমন - ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীকের রোজা।

রোজার হুকুম:

রমজানের রোজা ফরজ। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

অর্থাৎ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর। (সূরা বাক্বারা-১৮৩)

অত্র আয়াতের মাধ্যমেই রোজা ফরজ হয়েছে। আবার রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমা ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, রমজানের রোজাকে অস্বীকার করলে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। মানতের রোজা
ওয়াজিব। যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী-

وليوفوا نذورهم

অর্থাৎ: তারা যেন তাদের মানতসমূহ পূর্ণ করে। (সূরা হজ্জ-২৯)

উল্লেখ্য, হিজরি দ্বিতীয় সনে রমজানের রোজা ফরজ হয়েছে।

রোজার ইতিহাস

পূর্ববর্তী ধর্মমতে রোজা

মানুষের জন্য রমজানের রোজাই প্রথম রোজা নয়। কারণ, রোজা হল এমন ইবাদত,যা আল্লাহ্ তাআলা মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই নিজের বান্দার জন্য ফরজ করেছেন।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারা এর ১৮৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার"।

হজরত আদম আলাইহিস সালামের রোজা:

ফতহুল বারিতে এসেছে, ‘হজরত আদম আলাইহিস সালাস যখন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে জান্নাতের ফল খেয়েছিলেন তখন তিনি ৩০ দিন পর্যন্ত তাওবা করেছিলেন। ৩০ দিন পর আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুল করেন। তারপর থেকে তাঁর সন্তানদের জন্য ৩০টি রোজা ফরজ করে দেয়া হয়।

হজরত নূহ আলাইহিস সালামের রোজা

দুনিয়ার প্রথম রাসুল ছিলেন হজরত নূহ আলাইহিস সালাম। সে সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘হজরত নূহ আলাইহিস সালাম শাওয়াল মাসের ১ তারিখ এবং জিলহজ মাসের ১০ তারিখ ছাড়া সারা বছর রোজা রাখতেন।’ (ইবনে মাজাহ)

হজরত ইবরাহিম আলাহিস সালাম ও পরবর্তী যুগের রোজা

হজরত নূহ আলাইহিস সালামের পর সর্বাধিক পরিচিত নবি ছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা তাকে খলিল তথা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, তাঁর যুগেও ৩০টি রোজা রাখা আবশ্যক ছিল।

তাঁর পরের যুগকে বলা হতো বৈদিক যুগ। সে ধারাবাহিকতায় বেদের অনুসারী ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যেও ব্রত তথা উপবাস প্রথা চালু ছিল। তারা প্রত্যেক হিন্দি মাসের ১১ তারিখে ব্রাহ্মণদের ওপর একাদশী’র উপবাস করতো।

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের রোজা

আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে আসমানি কিতাব ‘তাওরাত’ নাজিল করার আগে ৪০ দিন রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে রোজা পালনে ক্ষুধা ও পিপাসায় ৪০ দিন অতিবাহিত করেছিলেন।

সে হিসেবে মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা ৪০ দিন পর্যন্ত রোজা পালনকে উত্তম বলে বিবেচনা করতেন। ৪০তম দিনে রোজা রাখাকে তারা ফরজ তথা আবশ্যক মনে করতো। আর তা ছিল তাদের সপ্তম মাসের (তাশরিন) দশম তারিখ। এ দশম দিন ছিল তাদের কাছে আশুরা।

এ আশুরার দিনে আল্লাহ তাআলা হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে ১০ আহকাম দান করেছিলেন। আর এ কারণেই তাওরাতে ১০ তারিখ রোজা পালনের জন্য জোর তাগিদ করা হয়। এছাড়াও ইয়াহুদিদের অন্যান্য ছহিফাগুলোতেও অন্যান্য দিনে রোজা পালনের হুকুম পাওয়া যায়।

হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের রোজা

হজরত মুসা আলাইহিস সালামের পর আসমানি কিতাবের অধিকারী ছিলেন হজরত দাউদ আলাইহিস সালাম। তাঁর যুগেও ছিল রোজার প্রচলন। তিনি একদিন পর একদিন রোজা রাখতেন। (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত) সে হিসেবে তিনি বছরের অর্ধেক সময় রোজা রেখে অতিবাহিত করতেন।হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় রোজা হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামে রোজা

নিজেকে আসমানি কিতাবের ধারক হিসেবে তৈরি করতে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিতাব আসার আগে দীর্ঘ ৪০ দিন পর্যন্ত রোজা রেখেছিলেন।
৪০ দিন রোজা পালনের পর আল্লাহ তাআলা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল দান করেন। আর খ্রিস্টান ধর্মে এখনও রোজা রাখার প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের রোজা

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সমসাময়িক নবি ছিলেন হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম। তিনি নিজে রোজা রাখতেন এবং তার অনুসারীগণের মধ্যেও রোজা রাখার রীতি বিদ্যমান ছিল।

আরববাসীরাও ইসলামের পূর্বে রোজা সম্পর্কে কমবেশী ওয়াকিফহাল ছিল। মক্কার কুরাইশগণ অন্ধকার যুগে আশুরার (অর্থাৎ ১০ মুহররম) দিনে এ জন্য রোজা রাখতো যে, এই দিনে খানা কাবার ওপর নতুন গেলাফ চড়ানো হতো। সহিহুল বুখারি ১৫৯২ নং হাদিসে হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ

তিনি বলেন, রমাযানের সওম ফরজ হওয়ার পূর্বে মুসলিমগণ আশূরার সওম পালন করতেন। সে দিনই কা'বা ঘর (গিলাফে) আবৃত করা হত। অতঃপর আল্লাহ যখন রমাযানের সওম ফর্য করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আশূরার সওম যার ইচ্ছা সে পালন করবে আর যার ইচ্ছা সে ছেড়ে দিবে।

মদীনায় বসবাসকারী ইহুদীরাও পৃথকভাবে আশুরা উৎসব পালন করতো। অর্থাৎ ইহুদীরা নিজেদের গণনানুসারে সপ্তম মাসের ১০ম দিনে রোজা রাখতো।

ইসলামী শরীয়তে রোজা ও তার পর্যায়ক্রম

মহাবিজ্ঞান ও হিকমতময় মহান আল্লাহর একটি হিকমত ও অনুগ্রহ এই যে, তিনি বান্দার উপর যে আদেশ-নিষেধ আরোপ করেছেন তার মধ্যে বহু বিষয়কেই পর্যায় অনুক্রমে ধীরে ধীরে ফরয অথবা হারাম করেছেন। অনুরূপ তাঁর এক ফরয হল রোজা। যা তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু করে ফরয করেছেন। যেমন:-

প্রথম পর্যায়ঃ-

প্রিয় নবী প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোজা পালন করতেন। আর এ দেখে সাহাবাগণও তাঁর অনুসরণে ঐ রোজা রাখতেন। যাতে করে রোজার অভ্যাস তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্যায়:-

কুরাইশদল জাহেলী যুগে আশুরার রোজা রাখত। (কুঃ ১৮৯৩ মুঃ ১১২৫) অতঃপর তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলে হযরত মুসা এর অনুকরণে তাঁর স্মৃতি পালন করে আশূরার দিনে খুব গুরুত্বের সাথে রোজা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকেও এ রোজা রাখতে আদেশ করলেন। তখন এ রোজা রাখা ফরয ছিল।

তৃতীয় পর্যায়:-

অতঃপর রোজার বিধান নিয়ে কুরআন কারীমের উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল। কিন্তু শুরুতে তখনও রোজা পূর্ণ আকারে ফরয ছিল না। যার ইচ্ছা সে রোজা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে না রেখে মিসকীনকে খাদ্য দান করত। তবে রোজা রাখাটাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিলঃ-

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থাৎ, যারা রোজা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোজা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। (কুঃ ২/১৮৪)

চতুর্থ পর্যায়ঃ-

অতঃপর সন ২ হিজরীর শা'বান মাসের ২য় তারীখ সোমবারে প্রত্যেক সামর্থ্যবান ভারপ্রাপ্ত মুসলিমের পক্ষে পূর্ণ রমযান মাসের রোজা ফরয করা হল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ۝

অর্থাৎ, রমযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোজা রাখে। (কুঃ ২/১৮৫)

আধুনিক যুগে রোজার পুনঃমূল্যায়ন

আজকের বৈজ্ঞানিক যুগেও রোজা প্রমাণ করেছে তার চিরন্তন উপকারিতা। চিকিৎসাবিদ্যায় "Intermittent Fasting" নামে পরিচিত উপবাস পদ্ধতি শরীর ও মনের জন্য উপকারী প্রমাণিত হয়েছে।কিন্তু ইসলামী রোজা শুধু শারীরিক নয়, বরং আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য- যা বিজ্ঞানের গণ্ডির বাইরেও এক অপূর্ব প্রশান্তি দেয়।

রমজান মাসের বৈশিষ্ট্য

সিয়াম ও কিয়ামের মাস

মুসলিম উম্মাহর নিকট রমযান মাসের আগমন ঘটে প্রধানত রোজা ও তারাবীহ'র বার্তা নিয়ে। এটি রমযান মাসের বিশেষ আমল। তাই প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য, পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে এ দুই বিষয়ে যত্নবান হওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি; যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বনকারী (মুত্তাকী) হতে পার। সূরা বাকারা (২) ১৮৩

কুরআন নাযিলের মাস

রমাযানুল মুবারকের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তা কুরআন নাযিলের মাস। এই পবিত্র মাসেই আল্লাহ তাআলা পূর্ণ কুরআন মাজীদ লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। অতপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কুরআনের সর্বপ্রথম অহীও এ মাসেই নাযিল হয়। ইরশাদ হয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সুপথ প্রাপ্তির সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক্ব-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই এর রোজা রাখে।সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

রহমতের মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়...

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشيَاطِين.ُ

যখন রমযান মাসের আগমন ঘটে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৭৯; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৬৮৪; সুনানে দারেমী, হাদীস ১৭৭৫

إِذَا كَانَ أَوّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النّارِ، وَذَلكَ كُلّ لَيْلَةٍ

যখন রমযান মাসের প্রথম রাতের আগমন ঘটে, তখন দুষ্ট জ্বিন ও শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে, হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণের প্রার্থী! থেমে যাও। আর আল্লাহ তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দান করেন। জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৮২; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস ৩৬০১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪২; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৫৭২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৮৯৬০

জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস এবং দুআ কবুলের মাস

আল্লাহ তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দান করেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য, বেশি বেশি নেক আমল এবং তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজেদেরকে এই শাহী ফরমানের অন্তর্ভুক্ত করা।

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

إِن لِلّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. وقال البوصيري : رجال إسناده ثقات

অবশ্যই আল্লাহ তাআলা রমযান মাসে প্রতি ইফতারের সময় অসংখ্য ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। প্রতি রাতেই তা হয়ে থাকে।

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৩, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২২০২, আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৮০৮৮; সুনানে বায়হাকী, হাদীস ৩৬০৫

পাপ মোচন ও গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের মাস

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন

الصلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُن إِذَا اجْتَنبَ الْكَبَائِر

পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমযান থেকে আরেক রমযান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মুছে দেয় যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৩ (৩)

ক্ষমা লাভের এমন সূবর্ণ সুযোগ পেয়ে যে ব্যক্তি নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করাতে পারে না সে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত। হাদীস শরীফে তার জন্য বদ দুআ করা হয়েছে।

লাইলাতুল কদরের মাস

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে মুসলিম উম্মাহর জন্য আরেকটি বিশেষ দান হল এক হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

‘লাইলাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিব্রীল আ.) তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে প্রত্যেক কল্যাণময় বস্তু নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। যে রাত পুরোটাই শান্তি, যা ফজর হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।’ সূরা কদর (৯৭) : ৩-৫

কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীসের আলোকে রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত:

রমযানের রোজা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম। ঈমান, নামায ও যাকাতের পরেই রোজার স্থান। রোজা হলো প্রত্যেক সজ্ঞান, বালেগ মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোজাভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমযান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, মুকীম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং হায়েয-নেফাসমুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমযান রোজা রাখা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(তরজমা) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৩

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(তরজমা) সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে।-সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين،
وفي رواية : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد

যখন তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোজা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোজা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ত্রিশ দিন রোজা রাখবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৮০ (১৭-১৮)

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস এবং এ বিষয়ক অন্যান্য দলীলের আলোকে প্রমাণিত যে, রমযান মাসের রোজা রাখা ফরয, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোজা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরয।

রোজার গুরুত্ব বর্ণনা করে মহানবী (সা.) বলেন, 'পাঁচটি বস্তুর ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, বাইতুল্লাহর হজ করা এবং রমজানের রোজা পালন করা।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮)

তাছাড়া কোনো শরয়ী ওযর ছাড়া কোন মুসলমান যদি রমযান মাসের একটি রোজাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধীরূপে গণ্য হবে। দ্বীনের মৌলিক বিধান লঙ্ঘনকারী ও ঈমান-ইসলামের ভিত্তি বিনষ্টকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীস শরীফে ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ত্যাগকারী ও ভঙ্গকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا : اصعد؛ فقلت : إني لا أطيقه. فقالا: سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت : ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال : قلت : من هؤلاء : قال : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم
رواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال : رجاله رجال الصحيح

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার নিকট দুই ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার বাহুদ্বয় ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে এল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের উপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। আমি উপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এ সব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের

আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশী দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোজা ভেঙ্গে ফেলে।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৯৮৬; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস-১৬০৯; তবারানী, হাদীস : ৭৬৬৬

এ পবিত্র মাসের রোজা যুগ যুগ ধরে রোজা রাখার চেয়েও উত্তম।এ মাসের একদিন রোজা না রাখলে মানুষ শুধু গুনাহগারই হয় না, ঐ রোজার পরিবর্তে আজীবন রোজা রাখলেও রমযানের এক রোজার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না এবং কোনোভাবেই এর যথার্থ ক্ষতিপূরণ আদায় হবে না।

যারা রোজা ভঙ্গ করে এবং রমজান মাসকে অবহেলা করে তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কিয়ামতের দিন একদল দোজখি লোককে দোজখ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে দোজখের দারোগা মালিককে তাদের দোজখে নিক্ষিপ্ত হবার কারণ জিজ্ঞেস করবেন রাসুলুল্লাহ (স.) এবং মালিক উত্তর দিবেন রোজাকে অবহেলা করার জন্য তাদের এ শাস্তি। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেন যারা রমজান শরিফের উপযুক্ত মর্যাদা দেয় না তাদের জিম্মা আমি নিব না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এমন কোন গোনাহ নেই যার জন্য নবী করিম (স.) সুপারিশ করবেন না, একমাত্র রোজার গাফিলতি ব্যতীত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন,

من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير سفر ولا مرض لم يقضه ابدا، وان صام الدهر كله، ... وقد ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم حيث قال : وبه قال ابن مسعود، وقال الشيخ محمد عوامة : وهذا الحديث موقوف لفظا مرفوع حكما

যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের একটি রোজাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোজা রাখলেও ঐ রোজার হক আদায় হবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৭৪৭৬; সহীহ বুখারী ৪/১৬০

হযরত আলী রা. বলেন-

من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه أبدا طول الدهر.

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযান মাসের একটি রোজা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোজার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না।- মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯৮৭৮

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) বলেন, যখন তিনি (মিম্বর থেকে) অবতরণ করলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা (মিম্বরে উঠার সময়) আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। উত্তরে তিনি বললেন, জিব্রিল (আ.) আমার নিকট আগমন করেছিলেন, যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলাম, তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে রমজান মাস পেল, তবুও তার গুনাহ মাফ হল না। আমি বললাম, আমিন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম তখন বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হল অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পড়ল না। আমি বললাম আমিন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম, তখন বললেন, ধ্বংস হোক ঐ ব্যক্তি যে বৃদ্ধ পিতা-মাতা উভয়কে অথবা একজনকে পেল অথচ তারা উভয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। অর্থাৎ তাদের খেদমতের মাধ্যমে নিজেকে জান্নাতবাসী করতে পারল না। আমি বললাম, আমিন।(মুসতাদরাকে হাকেম: ৭৩৩৮;মাযমাউয যাওয়াইদ: ১৭৩১৭)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোজার ফজিলত:

রোজার সবচেয়ে বড় ফজিলত আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা এবং নিজের প্রতিপালকের জন্য মানবিক চাহিদা বিসর্জন দিয়ে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও তাকওয়ার অনুশীলন
করা । নিম্নে হাদীস শরীফে বর্ণিত কয়েকটি ফজিলত উল্লেখ করা হলো।

রোজা শুধু আল্লাহর জন্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সাথে রোজার সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল ইবাদত-বন্দেগী থেকে রোজাকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন।

যেমন তিনি এক হাদীসে কুদসীতে বলেন:-

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه

মানুষের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোজা তার ব্যতিক্রম, হবে তা শুধু আমার জন্য, আমিই তার প্রতিদান দেব।-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৬০

এ হাদীস দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি নেক আমলের মাঝে রোজার গুরুত্ব আল্লাহর কাছে কত বেশি।

তাই সাহাবী আবু হুরাইরা রা. যখন বলেছিলেন-

يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له السنن

‘হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে অতি উত্তম কোন নেক আমলের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'তুমি রোজা পালন কর। কারণ এর সমমর্যাদার আর কোন আমল নেই।’-আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, হাদীস ২৫৩৪

রোজার এত মর্যাদার কারণ কী তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভাল জানেন। তবে, আমরা যা দেখি তা হল, রোজা এমন একটি আমল যাতে লোক দেখানো ভাব থাকে না। বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মধ্যকার একটি অতি গোপন বিষয়। সালাত হজ, যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী কে করল তা দেখা যায়। পরিত্যাগ করলেও বুঝা যায়। কিন্তু রোজা পালনে লোক দেখানো বা শোনানোর ভাবনা থাকে না। ফলে রোজার মাঝে ইখলাস, আন্তরিকতা বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতাও বেশি থাকে।

যেমন আল্লাহ বলেন:-

يدع شهوته وطعامه من أجلي

'রোজা পালনকারী আমার জন্যই পানাহার ও যৌনতা পরিহার করে।'-সহীহ মুসলিম ,২৭৬৩ তাই সিয়াম পালনকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছুর আশা করে না।

রোজা আদায়কারী বিনা হিসাবে প্রতিদান লাভ করে থাকেন

অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী ও সৎ কর্মের প্রতিদান বিনা হিসাবে দেয়া হয় না। বরং প্রত্যেকটি নেক আমলের পরিবর্তে আমলকারীকে দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেওয়া হয়।

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোজার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোজার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোজা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোজা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোজা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-
আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ‘‘প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোজা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

সারা জাহানের সর্বশক্তিমান প্রতিপালক আল্লাহ নিজেই যখন এর পুরস্কার দেবেন তখন কি পরিমাণে দেবেন? ইমাম আওযায়ী রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ যে সিয়াম আদায়কারীকে প্রতিদান দেবেন তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না।

রোজা ঢাল ও কুপ্রবৃত্তি থেকে সুরক্ষা

সিয়াম পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কু-প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:-

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

হে যুবকেরা! তোমাদের মাঝে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি-কে অবনত করে ও লজ্জাস্থানের সুরক্ষা দেয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ এটা তার রক্ষা কবচ। -সহীহ মুসলিম,১৪০০

এমনিভাবে সিয়াম সকল অশ্লীলতা ও অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:-

...والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم رواه

'রোজা হল ঢাল। সুতরাং তোমাদের মাঝে যে সিয়াম পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ ও শোরগোল থেকে বিরত থাকে। যদি তার সাথে কেউ ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারামারিতে লিপ্ত হতে চায় তবে তাকে বলে দেবে আমি সিয়াম পালনকারী। '-সহীহ মুসলিম,১৪০০

রোজা পালনকারী যেমনি নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তেমনি সকল অশ্লীল আচরণ, ঝগড়া-বিবাদ, অনর্থক কথা ও কাজ থেকে নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وأنا أجزى به ... فإن لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোজাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোজাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

রোজা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه أحمد، وذكره الهيثمي في المجمع وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب الأرنؤوط

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোজা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

রোজাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোজাদারগণের? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোজাদারগণের যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أن للصائمين باب في الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابدًا.

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোজাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولأهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোজাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে ‘রাইয়ান’। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

এ সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস -৩০৯)

রোজা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به.
وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোজা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোজা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال،

রোজা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১

রোজা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:-

والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

'যার হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন, সে সত্তার শপথ, সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মেশকের ঘ্রাণ হতেও প্রিয়।

-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

মুখের গন্ধ বলতে পেট খালি থাকার কারণে যে গন্ধ আসে সেটাকে বুঝায়। দাঁত অপরিষ্কার থাকার কারণে যে গন্ধ সেটা নয়।

রোজাদারের জন্য দুনিয়াতেও আনন্দ,পরকালেও আনন্দ

রোজাদারের জন্য দুনিয়াতেও আনন্দ, পরকালেও আনন্দ।
হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه ، وفي رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح

অর্থ: রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে।

(এক.)যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। এবং (দুই.) যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন রোজার কারণে আনন্দিত হবে।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১

ইফতারের সময় আনন্দ: ‘রোজা পালনকারী সর্বোত্তম নেক আমলের অন্যতম ইবাদত রোজা সম্পন্ন করার কারণে আল্লাহ তার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এ জন্য আনন্দ প্রকাশ করে।কারণ বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা এ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে; কেননা তারা রোজা পালন করে নি। বরং পানাহার ও স্ত্রী সহবাস যা আল্লাহ তার জন্য অন্য অবস্থায় হালাল করেছেন কিন্তু সাওম অবস্থায় হারাম করেছেন, তা দিয়ে (অবৈধ) আনন্দ-উদযাপনে লিপ্ত।

আল্লাহর দিদার লাভের সময় আনন্দ: ‘যখন একজন রোজা পালনকারী তার অতি দরকারী মুহূর্তে আল্লাহর কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবে তখন রোজার কারণে আনন্দ প্রকাশ করবে’।

রোজা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب: منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه. ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعني فيه. قال: فيشفعان

রোজা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ,হাদীস:৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম,হাদীস:২০৮০;বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

রোজা হল গুনাহ মাফের কারণ ও গুনাহের কাফফারা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোজা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ'র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

রোজা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোজার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোজার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোজাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

রোজাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৯

রোজাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোজাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫৩

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين.
وقال الترمذى : هذا حدي.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোজাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইজ্জতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. র্বণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته
وهذا الحديث إسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোজাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫

রোজা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،
وقال المنذري : ورجاله رجال الصحيح، ورواه أحمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابي ولم يسموه، (اى ابن عباس(

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোজা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৬৫২৩

আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرني بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له
قلت : يا رسول الله! مرني بعمل قال : عليك بالصوم، فإنه لا عدل له.

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো আমলের আদেশ করুন। তিনি বললেন, তুমি রোজা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কোনো নেক আমলের কথা বলুন, তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর কোনো সমতুল্য কিছু নেই।-সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩

عن أبى أمامة الباهلى قال : قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال : عليك بالصوم فإنه لا مثل له
هذا حديث إسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।-সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস :

এছাড়াও কোরআন হাদিসে রোজাদারের ব্যাপারে অসংখ্য ফজিলত এর কথা রয়েছে। তবে এ সকল ফজিলত পাওয়ার জন্য রোজাদারকে কতিপয় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা অনেকগুলো বিষয় এমন আছে রোজাদার সেগুলো করলে তার রোজা প্রতিদান এবং ফজিলত পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ সে উক্ত রোজার কোন প্রতিদান ও ফজিলত পায় না ।প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন

و رب صائم حظه من صيامه الجوع و العطش و رب قائم حظه من قيامه السهر

অনেক রোজাদার এমন রয়েছে যারা তাদের রোজার কারণে ক্ষুধার্ত অভিশপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান প্রাপ্ত হয়না ।

অনেক রাত্রি জাগরন করে এমন রয়েছে যারা রাত্রি জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কোন প্রতিদান পায় না।
(সহীহ ইবনে খুযাইমা হাদিস নং ৬৫৫১ সহীহ ইবনে হিব্বান হাদিস নং ৩৪৮১, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং ১৬৯০)

তাই রোজাদারের জন্য যাবতীয় নিষিদ্ধ খারাপ কাজ পরিহার করা অপরিহার্য।যেমনঃ

যাবতীয় হারাম পরিহার করাঃ

হাদিসে এসেছে

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك

অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধুলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, “হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম। কাজেই এমন ব্যক্তির দু’আ তিনি করে কবুল করতে পারেন ?”
(সহি: মুসলিম হাদিস নং-১০১৫)

মিথ্যা কথা বলা এবং অন্যায় কাজ পরিহার করাঃ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه

যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা এবং অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকবে না তাহলে তার সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা আল্লাহ তায়ালার কোন প্রয়োজন নেই।

(সহি: বুখারী হাদিস নং-১৯০৪, সুনানে তিরমিজি হাদিস নং-৭০৭, সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-২৩৬২, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং-১৬৮৯)

রোজাদার যাবতীয় ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকবেঃ

ঝগড়া-বিবাদ যেমনিভাবে মানুষের সম্পর্ক এবং পরিবেশকে নষ্ট করে তেমনি ভাবে তা আমলের প্রতিদান নষ্ট করে দেয়। তাই প্রতিটি রোজাদারের জন্য অপরিহার্য যে, কখনোই সে উক্ত জঘন্য কাজে জড়িয়ে পড়বে না। এ মর্মে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم

যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি রোজা রাখে তখন সে যেন কোন অশ্লীল কথাবার্তা বা ঝগড়া বিবাদ না করে। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাকে গালি দেয় তাহলে সে (রোজাদার) যেন (তার উত্তরে গালি না দেয় বরং সে বলবে) আমি রোজাদার।
(সহি: বুখারি হাদিস নং-১৯০৪, সহিঃ মুসলিম হাদিস নং-১১১৫, সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-২৩৬৩, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস ৬৮২,৬৮৩)

রোজার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুরুত্ব

আত্মশুদ্ধি

রমজান মাসে রোজা রাখার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। রোজা শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে বিরত থাকা নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ যা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারল না, তার শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে বিরত থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং ১৯০৩)
অর্থাৎ রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধা -তৃষ্ণা সহ্য করা নয়, বরং সকল প্রকার অন্যায় ও পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

তাকওয়া সৃষ্টি

রোজার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে তাকওয়া বা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মহান প্রভুর ভালবাসা ও ভয়ে বান্দার কিছুই গ্রহণ না করা এবং যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা 'তাকওয়ার' নিদর্শন। কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৩)

ঈমানদার হওয়ার প্রশিক্ষণ

রোজার মাঝে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখার সবিশেষ প্রশিক্ষণ। কারণ, রোযা হল গুপ্ত ইবাদত। যেহেতু মানুষ এ ইবাদতে মুনাফেকী রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলে সে গোপনে খেতে বা পান করতে পারে, অথবা উপবাস থেকেও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সুতরাং নিছক আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও সত্য ভয় না থাকলে প্রকৃতরূপে রোযা রাখা যায় না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি

রোজা হল এমন একটি আন্তরিক ইবাদত, যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে একান্ত গুপ্ত। অতএব গোপনে পানাহার করার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে বান্দা নিঃসন্দেহে এই বলে অটল বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তার গোপন সব কিছুই দেখেন ও জানেন। আর এখান থেকেই রোযাদারের মনে ইবাদতে সততা ও আমানতদারী সৃষ্টি হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা রোজাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন; বান্দার প্রত্যেক আমলের সওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ; বরং আরো অনেক অনেক গুণ বর্ধিত করে থাকেন। কিন্তু রোজা নয়। রোজাকে তিনি নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। আর তার সওয়াবের পরিমাণ যে কত, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তাতে তার সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোজা নয়। রোজা হল আমার জন্য। আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।

শিশুদের মনে আমানতদারীর বীজ বপনে সহায়ক

রোজা হল কচি-কাঁচা শিশুর মনের মাটিতে ‘আমানতদারী’র বীজ রোপণ করার এক বাস্তবভিত্তিক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রক্রিয়া। শিশু-কিশোরকে রোজা রাখতে অভ্যাসী করার সময় যখন তাকে পানাহার করতে নিষেধ করা হয় এবং খাবার ও পানি হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সে শুধু এই বিশ্বাসে তা খেতে পারে না যে, এ নিষেধ হল আল্লাহর এবং তিনি তাকে দেখছেন। অথচ এ ব্যাপারে কেবল তার মন ও বিবেক ছাড়া অন্য কেউ পর্যবেক্ষক নেই। সুতরাং কাঁচা মনে আমানতদারী বদ্ধমূল করতে এই অনুভূতি অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়াশীল আর অন্য কি হতে পারে?

যার ফলে শৈশব থেকেই শিশু আমানতদারীর মত এক নৈতিকতাপূর্ণ কর্মে অভ্যাসী হয়ে গড়ে ওঠে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তার যথার্থ হিফাযত করতে ও তার মনে তা আজীবন বহাল রাখতে কোন প্রকার কষ্টবোধ করে না।

রোজা রোজাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোযা তাকে তার প্রিয় বস্তু ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের

শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়।

মানুষের ষড়রিপু দমন

রোজা শুধু পেটের রোজা নয়। চোখের রোজা, কানের রোজা, মুখের রোজা, হাত-পায়ের রোজা। এই রোজার অর্থ হচ্ছে চোখ সে সব কিছু দেখবে না, কান সে সব কিছু শুনবে না, মুখ সে সব কিছু বলবে না, অঙ্গ-প্রতঙ্গ সে সব কাজ করবে না-আল্লাহ তাআলা যেসব অপছন্দ করেন এবং যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন।

রোজা ধৈর্য্যশীল হতে সাহায্য করে

রোজা রোজাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোজা তাকে তার প্রিয় জিনিস ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

)وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا(

“যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য ধৈর্যকষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি যে রুযী তাদেরকে দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে- তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম; (আদ্ন) স্থায়ী বেহেশত, ওতে ওরা প্রবেশ করবে---।” (কুরআনুল কারীম ১৩/২২-২৩)

রোজার সামাজিক গুরুত্ব

ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি রোজার সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

রোজার সামাজিক গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

আদর্শ সমাজ গঠন

রোজা নৈতিক উন্নতি, আত্মশুদ্ধি ও সামাজিক সাম্যের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে সাহায্য করে, যেখানে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, সহনশীলতা, এবং শান্তি বজায় থাকে। রোজা মানুষকে ধৈর্য, সংযম, এবং লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকতে শেখায়, যা সমাজে দুর্নীতি ও হিংসা - বিবেদ কমিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। রোজার মাধ্যমে গরিব ও অভাবী মানুষের কষ্ট অনুভব করা যায়, যা সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে এবং একে অপরকে সাহায্য করার মানসিকতা তৈরি করে।

সহানুভূতিশীল হওয়া

এ মাসে ধনী-গরীব একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকে। এই সময় ধনী ব্যক্তি যেহেতু না খেয়ে থাকে তাই সে গরীব মানুষের অভাব, ক্ষুধার কষ্ট এবং পানির পিপাসা সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পারে। তাই সে গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তাই মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, "রমযান মাস হল সহানুভূতিশীলের মাস"।

পারস্পরিক সৌহার্দ -সম্প্রীতি বৃদ্ধি হয়

রোজা পালনকারীরা রমাদান মাসে তাদের সামর্থ অনুসারে কাউকে ইফতার করালে তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার মতো বিশাল পুরস্কার ঘোষনা রয়েছে। উপরন্তু সিয়ামপালনকারীর সিয়ামের সওয়াবও বিন্দু পরিমাণ কম দেয়া হবে না মর্মে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন। তাই সিয়াম পালনের মাসে একে অপরকে ইফতার করানোয় সমাজের মুসলমানদের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় হয়।

যাকাত-ফিতরার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

পবিত্র সিয়াম সাধনার মাসে প্রতিটি নেক আমলের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তাই যাদের উপর যাকাত ফরয তারা বেশীর ভাগ এই মর্যাদাপূর্ণ মাসেই তাদের যাকাত আদায় করেন। এতে সমাজের দরিদ্র মুসলমাগণ যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদের দারিদ্র বিমোচনে কিছুটা হলেও

সুযোগ লাভ করেন। ফলে ধনী-গরীবের আর্থিক বৈষম্য কমে গিয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখে।

এছাড়া রমাযানে প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমকেই যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। ফলে সমাজের সামর্থবান মানুষদের সাথে একদিকে যেমন প্রতিবেশী দরিদ্র মানুষগুলোর পারস্পরিক সুসম্পর্ক বাড়ে, অপর দিকে সমাজের ধনী মুসলমাদের পাশাপাশি দরিদ্র মানুষগুলো সিয়াম পালন শেষে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় না। ধনী-গরীব সব মুসলমানের মাঝে বিরাজ করে আনন্দের আবহ।

পরিচ্ছন্ন সামাজিক জীবন

সিয়াম সাধনাকারীর এক মাস সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে তার দেহমনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এ মাসে সব কু-অভ্যাস ও অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে বলে সে পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস

রমজান মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রত্যেক মানুষ সমান। মানুষে মানুষে যে কোনো পার্থক্য নেই, তা ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সবার রোজা পালনের দ্বারা বুঝতে পারা যায়। সবাই একই সময়ে সাহরি খায়, একই সময়ে ইফতার করে, একই সময়ে তারাবির নামাজ পড়ে এবং রমজান শেষে ঈদের নামাজ আদায় করে। ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোনোরূপ ব্যবধান থাকে না।

সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হওয়া

রমযান মাসে ইফতারীর সময় এক অপর জনকে বাসায় দাওয়াত দেয় এবং অপরের বাসায় ইফতার পাঠায় এবং সাহরী ও ইফতারের সময় একই পরিবারের সকল সদস্যরা একত্রে আহার করে সকলের ভিতর একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে যা সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করতে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।

নিয়মানুবর্তিতা অর্জন

এই রমজান মাসে একজন রোযাদার নির্দিষ্ট সময়ে রোজা রেখে সাহরী গ্রহণ করে, তারপর আবার সে কিছু কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। এরপর আবার সে একটি নির্দিষ্ট সময় ইফতার করে। আবার সে কিছু সময়ের জন্য তারাবীহ পড়ে। দেখা যাচ্ছে এই রমযান মাসে একজন মুসলিমের নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়ে যায় যা আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়ক।

রোজার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা ও গুরুত্ব

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ মোতাবেক, রোজা বা সিয়াম হচ্ছে খাদ্য, পানীয়, ধূমপানসহ অন্যান্য কিছু বিধিনিষেধ থেকে নিজেকে সংযত রাখা অর্থাৎ সেগুলো এড়িয়ে চলা। মূলত নিজের মাঝে আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ গঠনের উদ্দেশ্যেই দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কিছু নিষেধাজ্ঞা মেনে চলার একটি ভক্তিমূলক অনুশীলনই হচ্ছে রোজা। রোজা পালনের যে শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যই আছে তা কিন্তু নয়। স্বাস্থ্যবিদ এবং গবেষকদের মতে, এর সাথে নিহিত আছে বেশকিছু বৈজ্ঞানিক উপকারিতা এবং স্বাস্থ্যগত কারণ ও উদ্দেশ্যও। চিকিৎসকদের মতে, দেহ, মন এবং মস্তিষ্কের জন্য রোজার মত স্বাস্থ্যকর এবং স্নায়বিক উপকারিতা সমৃদ্ধ শারীরিক অভ্যাস খুব কমই আছে। এমনকি সে যদি বিধানের কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়গুলো না জানে, তবু সে তা পালন করা থেকে পিছপা হয় না। তবে এটা নিশ্চিত যে আল্লাহর বিধান কল্যাণশূন্য নয়।

নিম্নে রোজা রাখার অসাধারণ উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

তারুণ্য ধরে রাখা

রোজা মানবদেহে তারুণ্য ও রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। জাপানের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইয়োশিনোরি ওহশোমি অটোফেজি নিয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তা হলো - মানুষের সারা শরীর ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষ দিয়ে গঠিত। এই কোষগুলো কিছুটা কারখানার মতো। এখানে সারা দিন কাজ চলছে, কিছু আবর্জনা তৈরি হচ্ছে, কিছু যন্ত্রপাতি ভেঙে যাচ্ছে, কিছু মেশিন নষ্ট হচ্ছে। সেগুলো মেরামতের প্রয়োজন হয়। এই কাজটা কোষ নিজেই করে

অটোফিজি নামক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অকার্যকর ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো রিসাইকেল করে তা আবার ব্যবহারের যোগ্য করে তোলে, কোষকে সতেজ হতে সাহায্য করে এবং শরীরে তারুণ্য ধরে রাখতে সহযোগিতা করে। এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে না হলে ব্রেনের বিভিন্ন রোগ যেমন আলঝেইমার্স—যে রোগে বয়স্করা ভুলে যেতে থাকে, আবোলতাবোল বলে; পারকিনসন্সের মতো রোগগুলোর সম্পর্ক থাকতে পারে। মানুষ যদি সারাক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকে, তখন অটোফেজি প্রক্রিয়া দমে থাকে। অন্যদিকে রোজা অবস্থায় অটোফেজি প্রক্রিয়া বেড়ে যায়। (প্রবন্ধ : Autophagy in healthy aging and disease)

শরীরের চর্বি কমানো

রোজা মেটাবলিক সুইচ করে শরীরের চর্বি কমাতে সাহায্য করে। মানুষের শরীর পরিচালনার জন্য জ্বালানির প্রয়োজন হয়। শরীর সেই জ্বালানি সংগ্রহ করে খাবার থেকে বা আগে থেকে জমিয়ে রাখা গ্লাইকোজেন থেকে। তা হলো এক প্রকার চিনি। মানুষ যখন রোজা রাখে তখন ১০-১২ ঘণ্টায় এই জ্বালানি শেষ হয়ে আসে। তখন পরিচালনার জন্য শরীরকে আগে থেকে জমানো চর্বিতে হাত দিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম মেটাবলিক সুইচ। অর্থাৎ চিনি থেকে সুইচ করে চর্বিতে আসা। সম্প্রতি করা গবেষণায় দেখা গেছে এই প্রক্রিয়ার ফলে মানবদেহে বেশ কিছু উপকারিতার সম্ভাবনা আছে। যেমন হার্ট ভালো রাখা, পেটের চর্বি কমা, ব্লাডপ্রেসার কমা, রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। (প্রবন্ধ : Flipping the Metabolic Switch : Understanding and Applying Health Benefits of Fasting)

পেটের স্বাস্থ্য ভালো হওয়া

মানবদেহের নাড়ি-ভুঁড়িতে অনেক জীবাণুর বসবাস, যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ আরো অনেকভাবে স্বাস্থ্যের উপকার করে। না খেয়ে থাকলে শরীরে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে। অর্থাৎ রোজা রাখলে এই ক্ষেত্রে উপকারিতা আছে। (প্রবন্ধ : Fasting challenges human gut microbiome resilience and reduces Fusobacterium)

ওজন কমানো

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের করা ৩৫টি গবেষণা একত্র করে দেখা গেছে, রমজানের রোজার পর গড়ে এক থেকে দেড় কেজি ওজন কমে। এটা গড় হিসাব। অর্থাৎ কারো ওজন এর

থেকে বেশি কমেছে, আবার কারো ওজন বেড়েছে। (প্রবন্ধ : Effects of ramadan and non-ramadan intermittent fasting on body composition : A systematic review and meta-analysis.)

রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ

রক্তে সুগারের মাত্রা থেকে বোঝা যায়, পরবর্তী সময়ে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি কেমন। নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে পরিমাণে বেশি সুগার থাকলে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। এই ক্ষেত্রে রোজা রাখলে উপকারিতা পাওয়া যায়। তুরস্কের গবেষকরা ইরান, মিসর, কুয়েতসহ আরো কয়েকটি দেশের করা ১৬টি গবেষণা একত্র করে দেখেছেন যে রোজা রাখার পর নারী-পুরুষ উভয়ের রক্তে সুগারের মাত্রা আগের চেয়ে ভালো হয়েছে।

আরেকটি আলাদা গবেষণায় ইন্দোনেশিয়ার গবেষকরা ২৮টি গবেষণা একত্র করে দেখেছেন, রমজানের রোজা রাখার ফলে ডায়াবেটিক রোগীদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খানিকটা উন্নতি হয়েছে। যারা ডায়াবেটিক রোগী তারা রোজা রাখা অবস্থায় আপনার ওষুধ কখন ও কিভাবে গ্রহণ করবেন, সেটা চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন। (প্রবন্ধ : Time restricted eating for the prevention of type 2 diabetes)

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ

রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রোজা উপকারী। মানুষের রক্তে এক ধরনের চর্বি থাকে, যাকে কোলেস্টেরল বলে। কোলেস্টেরল অনেক বেশি পরিমাণে থাকলে রক্তনালিতে চর্বি জমে নালি সরু হয়ে যেতে পারে। এতে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও বাহরাইনের গবেষকরা ৯১টি গবেষণা একত্র করে দেখেছেন, রমজানের রোজায় রক্তে কোলেস্টেরল আগের তুলনায় ভালো নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশেরও তিনটি গবেষণা আছে। (প্রবন্ধ : Effect of Ramadan Fasting on Total cholesterol (TC) Low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and High density lipoprotein cholesterol (HDL-C) in Healthy Adult Male)

ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ

২০১৯ সালে লন্ডনের পাঁচটি মসজিদে একটি গবেষণা হয়। গবেষণার নাম 'লন্ডন রামাদানস স্টাডি'। রমজানের আগে-পরে ব্লাড প্রেসার মেপে দেখা যায় কোনো পরিবর্তন আছে কি না? সেখানে দেখা গেল সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার তথা ব্লাড প্রেসারের ওপরের সংখ্যাটা কমেছে সাত মিলিমিটার মার্কারি আর দ্বিতীয় সংখ্যাটি কমেছে তিন মিলিমিটার মার্কারি। ভারত, পাকিস্তান, কাতারসহ অন্যান্য দেশের আরো ৩২টি গবেষণা একত্র করে দেখা গেছে, রমজানের রোজায় ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে উন্নতি আসে ওজন না কমলেও। ইফতার ও সাহরিতে বেশি বেশি ফলমূল খেলে ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করা আরো সহজ হবে। (প্রবন্ধ : Effect of Religious Fasting in Ramadan on Blood Pressure: Results From LORANS (London Ramadan Study) and a Meta Analysis)

এভাবে রোজা আমাদের শরীরের বিভিন্ন ভয়াল রোগ দূরীভূত করে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বলা যায়, মুসলমানদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যায় পবিত্র মাহে রমজান। আমার এ ছোট্ট প্রবন্ধের ইতি টানব একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মাধ্যমে। ১৯৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের বিশ জন চিকিৎসক মিলে গবেষণা করে বলেছেন, "রোজা গ্যাসট্রিক আলসার ও পেট ব্যাথার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। পুরো বৎসরে যে সমস্ত জৈব বিষ দেহের ভিতর জমা হয়, সেসব বিষাক্ত জৈব রোজার মাধ্যমে জ্বলে, পুড়ে রক্ত পরিষ্কার করে। ফলে শরীর বিষমুক্ত হয়।"

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা মূলত শ্বেত রক্তকণিকা দ্বারা পরিচালিত। রোজা রাখার ফলে পুরনো শ্বেত রক্তকণিকাগুলো পুনরায় পুনরোজ্জীবিত হয় এবং আগের চেয়েও স্বাস্থ্যকর ও দৃঢ় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।
এছাড়াও, রোজার পরে ইফতারে পুনরায় খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের দেহের স্টেম সেলগুলো আবারো সজীব হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে দেহ সতেজ ও সুস্থ থাকে।

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে

শুধু শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই যে রোজা আমাদের দেহের জন্য উপকারী বা গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু নয়। রোজায় পর্যাপ্ত মানসিক বিকাশ অর্জনের ফলে মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয় নিউরোট্রফিক

ফ্যাক্টরের (neurotrophic factor) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মস্তিষ্কের কোষের বৃদ্ধিসাধন হয় এবং মস্তিষ্ক আরো কর্মক্ষম হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ নিশ্চিতকরণ

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের মানসিক সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতেও রোজার বিকল্প নেই। রোজা আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং স্বচ্ছ মানসিক অবস্থা নিশ্চিত করে। এটি প্রাথমিকভাবে ঘটে মূলত সঠিক মাত্রায় ক্যালরি, লবণ এবং শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত, রোজার সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় আমাদের দেহ এন্ডোরফিন (endorphin) নামক রাসায়নিক উপাদানে পরিপূর্ণ থাকে। এর ফলে আমাদের দেহে মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত হয় এবং দীর্ঘসময় পর্যন্ত আমাদের মন প্রফুল্ল থাকে।

তৃতীয়ত, রোজা রাখার ফলে এড্রেনাল গ্রন্থি থেকে উৎপাদিত কর্টিসল হরমোন এর হার তুলনামূলকভাবে কমে যাওয়ায় একজন ব্যক্তি কম মানসিক চাপ অনুভব করেন। এর ফলে মন দুশ্চিন্তামুক্ত থাকে এবং ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

রোজা যে শুধু একটি ধর্মীয় চর্চাই তা কিন্তু নয়। অধ্যবসায়, সংযম এবং দেহের সার্বিক সুস্থতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নতিতে রোজার গুরুত্ব অপরিসীম, এবং কোন বিকল্পই নেই। তাই আমাদের উচিত নিয়মিত ইবাদতের পাশাপাশি পরিমিত খাদ্যাভ্যাস এবং যথার্থ বিশ্রামের সাথে রোজা পালন করা, রোজার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা গুলো সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা।

মানসিক প্রশান্তি

রমজান মাসে ধ্যান ও ইবাদতের মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়। এই মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও জিকিরের মাধ্যমে মানসিক চাপ কমে এবং আত্মিক শান্তি লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "রমজান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, ফলে মানুষ ভালো কাজ করতে সহজ হয়।" (সহীহ বুখারি, হাদিস নং ১৮৯৯)

রমজান মাসের আমল

রমজান মাসে বিশেষ কিছু ইবাদত ও আমল রয়েছে, যা এই মাসের ফজিলতকে আরও বৃদ্ধি করে। এই মাসে বেশি বেশি ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। নিম্নে রমজানের বিশেষ ইবাদত ও আমলগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

নিয়তের পরিশুদ্ধিতা

সমস্ত কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রথমেই আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। রমযানে আমরা যে ভালো কাজই করি না কেন তা সবই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করবো। সাওম পালন, তাহাজ্জুদ পড়া, তারাবীহ পড়া, দান-সদকা করা, সাওম পালনকারীকে ইফতারী করানো, ঈদের হাদিয়া, যাকাত-ফিতরা ইত্যাদি বিতরণ সব আমলের পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জন।

পরিবারের সবাই সাওম পালন করা

প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ, মুকীম সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর রোজা পালন ফরয। তাই নিজে যেমন রোজা পালন করবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও রোজা পালনের আদেশ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, রমযান মাসে রোজা পালনই সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদাত। এভাবে ছোটদেরকে সাওম পালনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের সাওম পালন করে, তার
পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়"।

জামা'আতের সাথে সালাত আদায়

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। আর রমযান মাসে কোনো নেক আমল সত্তর গুণ বা ততোধিক বৃদ্ধি পায়। তাই পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

আল্লাহভীতি অর্জন

রোজার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহভীতি তথা তাকওয়া অর্জন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:
يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة[١٨٣ :

"হে ঈমিনদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা পরহেযগারী

সাহরী

সাহরীতে রয়েছে বরকত।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

تَسَحّرُوا فَإِنّ فِي السّحُورِ بَرَكَةً.ً

তোমরা সাহরী কর। কেননা সাহরীর খাবারে বরকত রয়েছে। সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯২৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৫

অতএব সাহরীর খাবার রোজা রাখতে শক্তি যোগায়। তেমনি এতে খায়র ও বরকত এবং পুণ্য ও কল্যাণও নিহিত রয়েছে।

যারা সাহরী গ্রহণ করে তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।

আরেক হাদীসে এসেছে

السّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنّ اللهَ عَزّ وَجَلّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى الْمُتَسَحّرِين.َ

সাহরী খাওয়াতে বরকত রয়েছে। অতএব তোমরা তা ছেড়ো না; এক ঢোক পানি পান করে হলেও সাহরী গ্রহণ কর। কেননা যারা সাহরী খায় আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১১০৮৬, ১১৩৯৬

সাহরী আমাদের রোজার একটি বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি, রোজার বা সিয়ামের বিধান এ উম্মতের জন্য প্রথম নয়; পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও রোজার বিধান ছিল। তবে আমাদের রোজা ও আহলে কিতাবের রোযার মাঝে সাহরী একটি বিশেষ পার্থক্যরেখা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السّحَرِ.ِ

আমাদের রোজা ও আহলে কিতাবের রোযার মাঝে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৬

অর্থাৎ আমাদের রোজায় সাহরী খাওয়ার যে গুরুত্ব ও ফযীলত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তা নেই। আমাদের নিকট সাহরী করাটাই একটি স্বতন্ত্র আমল এবং বড় সওয়াবের কাজ।

ইফতার

অস্তপ্রায় সূর্য। কিছুক্ষণের মাঝে তা হারিয়ে যাবে পশ্চিমাকাশে। সাধ্য অনুসারে ইফতারের আয়োজন সামনে নিয়ে রোযাদার অপেক্ষায় আছে সূর্যাস্তের। হাতে খাবার। পেটে ক্ষুধা। পিপাসাকাতর ক্লান্ত শরীর। তবুও কিছু মুখে দিচ্ছে না। কারণ এখনও আল্লাহর হুকুম হয়নি।

সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! আল্লাহ তাআলার নিকট এ দৃশ্যটি অত্যন্ত প্রিয়। বান্দার এ সময়ের এ অবস্থাকে আল্লাহ পাক বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

ইফতারের সময় বান্দার দেহমনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

لِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ.

রোযাদারের জন্য দুটি বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি হল, ইফতারের সময়। অপরটি হল, যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে (আর তিনি তাকে বিশাল পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করবেন)। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১
পুরো রমযানই রহমত-বরকতের মাস। তবে কিছু কিছু মুহূর্তে বান্দার প্রতি তা প্রবল বেগে ধাবিত হয়। ইফতারের সময়টিও এমন। তাই এ সময়ের দুআ আল্লাহ পাক বিশেষভাবে কবুল করেন। নবীজী বলেন

إِنّ لِلصّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدّ

ইফতারের সময় রোজাদারের একটি দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ কমপক্ষে একটি দুআ অবশ্যই কবুল হয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৫৩

রোজাদারকে ইফতার করাই

ইসলামে মেহমানদারি ও আপ্যায়নের ফজিলত অনেক। আর যদি সেই আপ্যায়ন হয় রোজাদারকে ইফতার-আপ্যায়ন তাহলে তো তা আরো বেশি ফজিলতের! রোযাদারকে ইফতার করানো অনেক বড় সওয়াবের আমল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

مَنْ فَطّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصّائِمِ شَيْئًا

কেউ যদি কোনো রোজাদারকে ইফতার করায় তাহলে সে ঐ রোজাদারের সমান সওয়াব লাভ করবে। আর এতে ঐ রোজাদারের সওয়াবে কোনো কম করা হবে না। জামে তিরমিযী,

হাদীস ৮০৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭৪৬; সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ৩৩১৬, ৩৩১৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭০৪৪, ১৭০৩৩

তারাবীহ্

রমযান মাসের বিশেষ একটি আমল হচ্ছে রাতে ঈশার নামাযের পর বিতরের পূর্বে তারাবীহ্ নামায আদায় করা। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমযানের দিবসের রোজাকে ফরয করেছেন। আর তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানে নবুওতের মাধ্যমে 'কিয়ামে রমাযান'-এর ঘোষণার মাধ্যমে তারাবীহ্ মতো মূল্যবান এ তোহফা দান করেছেন। বস্তুত তারাবীহ রমযান মাসের এমন একটি বিশেষ ইবাদত, যা রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে আদায় করা সম্ভবই না। রমযান মাসের অন্যান্য আমল রমযান ছাড়াও আদায় করা যায়। যেমন রমযান মাস ছাড়াও রোজা রাখা যায়, ইতিকাফ করা যায়। কিন্তু রমযান ছাড়া অন্য সময় তারাবীহ আদায় করা যায় না। এমনকি চাঁদ ওঠার পর তারাবীহ্ নামাযের মাধ্যমেই রমযানের মূল আমল শুরু হয়। অতএব রমযান মাসে তারাবীহ্ নামায অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ইবাদত।

তারাবীহতে কালামুল্লাহ্ এর সাথে বান্দার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে কিয়ামে রমযান আদায় করবে তার বিগত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৯

রমযানুল মুবারকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করি

রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন এ মাসে। আল্লাহ তাআলা বলেন

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه ُ

রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়েতের দিশারী, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের যে এ মাস লাভ করবে, সে যেন তাতে অবশ্যই রোযা রাখে। সূরা বাকারা (২) : ১৮৫

তাই এ মাসে কুরআনের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতেই নেকী ও কল্যাণের ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। রমযান মাসে এক্ষেত্রে নবীজী আরো অগ্রগামী হতেন। হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম রমযানের প্রতি রাতে নবীজীর নিকট আসতেন। তিনি নবীজীকে পুরো কুরআন শোনাতেন এবং নবীজীও তাকে কুরআনুল কারীম শোনাতেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০২)

লাইলাতুল কদর :

রমযানের পুরো মাস জুড়ে বিরাজ করে রহমত বরকত এবং ক্ষমার ঘোষণা। তবে এ মাসে রয়েছে বিশেষ এক মহিমান্বিত রজনী লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা এ রাতের ব্যাপারে বলেন

لَیْلَةُ الْقَدْرِخَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ، سَلٰمٌ ، هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْر.ْ

কদর রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই রজনীতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতরণ করেন প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সেই রজনী সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত। সূরা কদর (৯৭) : ৩-৫

তাই এ রাতের অন্বেষণে যেমন আগ্রহী হওয়া জরুরি তেমনি এ রাতে ইবাদত বন্দেগী নফল নামায, তিলাওয়াত, যিকির, তওবা-ইস্তিগফার, দুআ-দরূদ ইত্যাদির প্রতিও আরো যত্নবান হওয়া কাম্য।

লাইলাতুল কদরের রাতে গুনাহ মাফ হয়।

এ রাতে আল্লাহ তাআলার অবারিত রহমত ও করুণা বর্ষিত হয়। নবীজী বলেন

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাব তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সওয়াব প্রাপ্তির প্রত্যাশায় লাইলাতুল কদরে কিয়াম (ইবাদত-বন্দেগী) করবে, তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১৪

তো ঈমান ও ইহতিসাবের উপলব্ধি জাগরূক রেখে লাইলাতুল কদরে কিয়াম (ইবাদত-বন্দেগী) করা বান্দার গুনাহ মাফের একটি বড় মাধ্যম।

শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের সন্ধান করা

পবিত্র মাহে রমজানে এমন বরকতময় একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল কোরআনে আছে- 'কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।' [সুরা কদর : ৪]

মহিমান্বিত এ রজনী পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। এক হাদিসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা বলেন : 'রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য সময়ের তুলনায় রমজানের শেষ দশ দিনে অধিক হারে পরিশ্রম করতেন।' [সহিহ মুসলিম : ১১৭৫]

লাইলাতুল কদর থেকে বঞ্চিত হওয়া অনেক বড় মাহরূমী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এত বড় খোশখবরী পাওয়ার পর এ রাতের ক্ষমা ও রহমত লাভের চেষ্টা না করা অনেক বড় বঞ্চনার বিষয়। হযরত আনাস রা. বলেন, রমযান আসলে নবীজী বলতেন

إِنّ هَذَا الشّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلّا مَحْرُومٌ.

এই মহিমান্বিত মাস উপস্থিত। তাতে একটি রজনী রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হল সে যেন সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হল। আর কেবল অভাগাই এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৪; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ২১০৬; সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদীস ২৪২৭

সুতরাং হেলায় না কাটিয়ে কদরের রাতের কদর করা দরকার।

বেশি বেশি নফল ইবাদত করা

এ মাসে শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। এ সুযোগে বেশি পরিমাণে নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা যায়। অন্তত বিভিন্ন সময়ের নফল নামাজগুলো আদায় করা যেমন - ইশরাক, চাশত, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি। এ মাসে একটি ভালো কাজের বিনিময়ে অনেক নেকি অর্জন করা সম্ভব। কাজেই প্রত্যেক মুমিনের উচিত যথাসম্ভব ভালো কাজ করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এ মাসের প্রতি রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে আহবান করতে

থাকে, হে কল্যাণের অনুসন্ধানকারী, তুমি আরো অগ্রসর হও। হে অসৎ কাজের পথিক, তুমি অন্যায় পথে চলা বন্ধ করো। তুমি কি জানো, এ মাসের প্রতি রাতে আল্লাহ কত লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন? (তিরমিজি, হাদিস : ৬৮৪)।

ওমরাহ পালন করা

মাহে রমজানে একটি ওমরাহ করলে একটি হজ আদায়ের সমান সাওয়াব হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'রমজান মাসে ওমরাহ করা আমার সঙ্গে হজ আদায় করার সমতুল্য। ' সহিহ আল-বুখারী : ১৮৬৩

অধিক পরিমানে দান-সদাকাহ করা

পবিত্র মাহে রমজানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসের থেকে দান সদকা বাড়িয়ে দিতেন। আমাদেরও উচিত পবিত্র এই মাসে বেশি বেশি সদকা করা। যাকাত যাদের ফরজ তারা অবশ্যই জাকাত আদায় করে থাকেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত : 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল আর রমজানে তাঁর এ দানশীলতা আরও বেড়ে যেত। ' [সহিহ আল-বুখারী : ১৯০২]

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে অংশগ্রহণ করা

মাহে রমজান উত্তম আমলের মাস। আর দ্বীনের দাওয়াত এমনিতেই উত্তম একটি আমল। দ্বীনের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকা হয়। বিপথগামী বান্দাহকে মহান স্রষ্টার দিকে ডেকে আনা।

আল কোরআনের ঘোষণা : 'ওই ব্যক্তির চাইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহ তাআলার দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং ঘোষণা করল, আমি একজন মুসলিম।' [সুরা হা-মীম সাজদাহ : ৩৩]

তাহাজ্জুদ:

তাহাজ্জুদ অত্যন্ত মূল্যবান আমল। কুরআনে কারীমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদের বিশেষ হুকুম করা হয়েছে। তাহাজ্জুদের সময় তথা রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর রহমত বান্দার প্রতি নিবিষ্ট থাকে। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ডেকে ডেকে বলতে থাকেন

مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه.ُ

আছে কি কেউ, যে আমাকে ডাকবে অমি তার ডাকে সাড়া দিব। কেউ আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দিয়ে দিব। কেউ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে ফজর পর্যন্ত প্রতি রাতে রাব্বুল আলামীন এভাবে বান্দাকে ডাকতে থাকেন। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮)

এসময় বান্দার উচিত রবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাহাজ্জুদের সালাতে মশগুল হওয়া। কারণ, নবীজী বলেছেন

أَفْضَلُ الصّلَاةِ، بَعْدَ الصّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصّلَاةُ فِي جَوْفِ اللّيْلِ ِ

ফরয নামাযের পর মধ্যরাতের নামায সর্বোত্তম। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩

রাতের বরকতপূর্ণ এ মুহূর্ত যদি আসে রমযানের মত রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাসে! রমযানের রহমত ও মাগফেরাতের সাথে যদি যুক্ত হয় মধ্য রাতের এ খোশখবরি, মহান রবের পক্ষ থেকে দয়া ও ক্ষমার ঘোষণা এবং প্রাপ্তির আহ্বান! মুমিনের জন্য এরচেয়ে মূল্যবান মুহূর্ত আর কী হতে পারে! তাই রমযান মাসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাহাজ্জুদের প্রতি মনোযোগী হওয়াটাই মুমিনের শান।

শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা:

দুনিয়ার মায়াজাল ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে রমযানের শেষ দশ দিন কোনো জামে মসজিদে একাগ্রচিত্তে যিকির-আযকার, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে কেটে দেওয়া হলো ই'তিকাফ। ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়াহ।ই'তিকাফকারী লাইলাতুল ক্বদরের সৌভাগ্য প্রাপ্ত থেকে পারেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন

أَنّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتّى تَوَفّاهُ اللهُ عَزّ وَجَلّ، ثُمّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। নবীজীর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৭২; সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৬

যাকাত আদায় করা

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। সালাতের পরেই এর স্থান। প্রত্যেক ধনবান ব্যক্তি যার সম্পদ যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয়েছে তাদের যাকাত আদায় করা ফরয। রমযানে একটি ফরয আদায় করলে সত্তরটি ফরয আদায় করার সাওয়াব। তাই এ মাসে যাকাত আদায় করলে অতিরিক্ত সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

ফিতরাহ দেওয়া

এ মাসে সিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণার্থে ফিতরাহ দেওয়া আবশ্যক। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাজ আদায়ের পুর্বে ফিতরাহ আদায় করার আদেশ দিলেন। [সহিহ আল-বুখারী :১৫০৩]

রমজান মাসের বর্জনীয় কাজ

নিম্ন উল্লেখিত কাজ সমূহ থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে -

১) ইফতার পার্টি নামে ফাজলামো না করা: আমাদের সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে রমজান মাস আসলে তারা ইফতার মাহফিলের নামে নারী-পুরুষ বেপর্দা ও বেহায়াপনার মাধ্যমে একত্রে বসে ইফতার করে। যেটাকে তারা নাম দিয়েছে ইফতার পার্টি। পার্টি ইসলামিক নন-ইসলামিক সব অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মাহফিল শুধু ইসলামিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইফতার পার্টি না বলে ইফতার মাহফিল বলাটা উত্তম মনে করি। ইসলামে পর্দার বিধান ফরয, এ ফরয হুকুমকে অমান্য করে ইফতারের নামে প্রচলিত ইফতার পার্টি নামক যে বেহায়াপনা ছড়ানো এটা ইসলাম পছন্দ করে না। আমাদের সবার উচিত এ ইফতার পার্টির নামে বেহায়াপনা না করা।

২) রমজান ও ব্যবসায়িক শোষণ:রোজার মাসে মুনাফা নয়, বরং মেহেরবানি প্রয়োজন। রমজান এলেই সমাজে নিচু মানসিকতা সম্পন্ন একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। প্রতি রমজানেই নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর । যদিও অনেক বিত্তশালী মুসলমান এ মাসেথাকেন, রোজাদারদের ইফতার করিয়ে থাকেন। কিন্তু এসব নেক আমল ও জনকল্যাণমূলক কাজ চাপা পড়ে যায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কাছে।

নবী কারীম (সা.) বলেছেন, কেউ যদি খাদ্য গুদামজাত করে কৃত্রিম উপায়ে সংকট তৈরি করে, আল্লাহ তাকে দুরারোগ্য ব্যাধি ও দারিদ্র্য দ্বারা শাস্তি দেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২/৭২৯)।

৩) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কত রোজা পালনকারী এমন আছে, (রোজা অবস্থায় মন্দ কথা ও কর্ম থেকে বিরত না থাকার ফলে) ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া রোজা থেকে সে আর কিছু লাভ করতে পারে না। অনুরূপ অনেক রাত জাগরণকারী এমন আছে যে রাত জেগে থাকার কষ্ট ছাড়া সে আর কিছু পায় না। (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ১৬৯০)

৪) বিবাদ ও বেহায়াপনা : মাহে রমজানে মুমিনকে যাবতীয় ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, অশ্লীল কথা ও বেহায়াপনা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে টিভি , ইউটিউবে গান-বাজনা ও টিভিসহ মোবাইলের অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকতে হবে। তবেই সিয়ামের সওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যাবে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ সিয়াম পালন করবে, তখন সে কোনো মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন সে যেন বলে, আমি রোজাদার। (বুখারি, হাদিস: ১৯০৪)

৫) অধীনস্থদের কাজের চাপ লাঘব করে দেয়া : যার ওপর সওম ফরজ, এমন প্রত্যেক কর্তাব্যক্তিদের কর্তব্য হলো, নিজে এ ফরজ ইবাদতটিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করবে ও সে সঙ্গে অধীনস্থ রোজাদার কর্মীর কাজের ভার কিছুটা লাঘব করার চেষ্টা করবে।

রাসুল (সা.) বলেন, এ মাসে (রমজানে) যারা দাস-দাসীর প্রতি সদয় ব্যবহার করে। অর্থাৎ তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেন। জাহান্নামের আগুন থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।’ (সহিহ ইবনে খোজায়মা : ৩/৩৪১)।

এটি যেমন এক রোজাদার বান্দার ওপর অনুগ্রহ, তেমনি একটি ফরজ ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা। পাশাপাশি তা ফরজ আদায়ে উৎসাহিত করারও একটি উপায়।

রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহ তোমাদের ভাইদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব, যার অধীনে কোনো ভাই থাকে, তাকে তা-ই খাওয়াবে, যা সে নিজে খায়; তাকে তা-ই পরাবে, যা সে নিজে পরে এবং তাকে সাধ্যের অধিক কাজ চাপিয়ে দেবে না। অগত্যা তাকে দিয়ে যদি কোনো কষ্টের কাজ করাতে হয়, তাহলে তাকে সাহায্য করবে। (বোখারি: ২৫৪৫, মুসলিম: ১৬৬১)।

৬) গিবত না করা : গিবত আমল ধ্বংসের নীরব ঘাতক। গীবতের কারণে কখন যে আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে তা বুঝতেই পারবেন না। গিবত জিনার চেয়েও জঘন্যতম গুনাহ। তাই গিবত পরিহার উচিত।

৭) অপচয় ও অপব্যয় না করা : অপচয় কিংবা অপব্যয় করা খুবই বাজে ও গর্হিত অভ্যাস। পবিত্র কোরআনে অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। অপচয়-অপব্যয় ত্যাগ করার অর্থ হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

৮) রিয়া বা লোক-দেখানো ইবাদত : রিয়া হলো লোক-দেখানো ও আত্মপ্রদর্শনকারী কাজ বা আমল। রিয়া করা শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম। শিরক হলো দুই প্রকার। আর এ রিয়া হলো ছোট শিরক। ফলে রিয়া থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

৯) মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা : মিথ্যাকে সব পাপের জননী বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে রোজা রেখেছে অথচ মিথ্যাচার পরিহার করেনি, তার এ কৃত্রিম পানাহার বর্জনের কোনো প্রয়োজন আল্লাহর কাছে নেই। (বুখারি, হাদিস: ১৯০৩)

১০) বিদয়াত কর্মকাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসা :
রমজান মাসের শেষ ১০ দিন অনেক বরকতময়। এ দশকের যে কোনো বিজোড় রাতে লাইলাতুল কদর হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। তাই এ সময়টা সর্বোচ্চ আগ্রহ নিয়ে ইবাদতে মশগুল থাকা কাম্য ছিল। অথচ আমাদের সমাজে কিছু শ্রেণির মানুষ আছে যারা ২৭ রমজানকেই লাইলাতুল কদর মনে করে যেটা একদমই ঠিক না। আমাদের উচিত রমজান মাসের শেষ ১০ দিনে বিজোড় রাতে লাইলাতুল কদর সন্ধান করা।

সমাজে প্রচলিত ‘সাতাইশা’-এর নামে শুরু হয় কোরআন-সুন্নাহবিরোধী বেদাতি সব কর্মকাণ্ড। ন্যূনতম দ্বীনদার হলেও এসব ক্ষতিকর রেওয়াজ-প্রথা থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য। বিদআত বিরুদ্ধে রাসুল (সা.) অত্যন্ত কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো, (দ্বীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত বিষয়। (দ্বীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত সবকিছুই বিদয়াত। প্রত্যেক বিদয়াত ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।’ (মুসলিম : ১৫৩৫, নাসাঈ : ১৫৬০)। রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে স্বীকৃত নয়, এমন কোনো আমল করল, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।’ (বুখারি: ২৬৯৭, মুসলিম: ১৭১৮)।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রমজানের সকল রোজা রাখার তাওফিক দান করুন। পাশাপাশি এ পবিত্র মাসে যে কাজগুলো আমাদের করণীয় তা করার তাওফিক দান করুক। যে কাজগুলো বর্জনীয় তা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুক।

অন্যান্য নফল রোজার ফজিলত

রমজানের রোজা ইসলামের আবশ্যকীয় মৌলিক বিধান। রমজানের ফরজ রোজার পাশাপাশি নফল রোজারও অনেক ফজিলত ও গুরুত্ব রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে নফল রোজা রেখেছেন এবং উম্মতকেও তা পালনে যথাযথ উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিচে হাদিসে বর্ণিত নফল রোজাগুলোর ফজিলত তুলে ধরা হলো—

শাওয়াল মাসের ছয় রোজা

রমযান মাস সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য এক বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন — শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা। এটি রমযানের রোজার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং বান্দার নেক আমলকে পরিপূর্ণ করে। ইসলামে এই রোজার ফজিলত অত্যন্ত বেশি।
যে ব্যক্তির রমাযানের রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে, তার জন্য শওয়াল মাসের ৬টি রোজা রাখা মুস্তাহাব। আর এতে তার জন্য রয়েছে বৃহৎ সওয়াব। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি রমাযানের রোজা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে সে ব্যক্তির পূর্ণ বৎসরের রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ হয়।" (মুসলিম ১১৬৪নং, সুনানে আরবাআহ; আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

এই সওয়াব এই জন্য হবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে ১টি কাজের সওয়াব ১০টি করে পাওয়া যায়। অতএব সেই ভিত্তিতে ১ মাসের (৩০ দিনের) রোযা ১০ মাসের (৩০০ দিনের) সমান এবং ৬ দিনের রোযা ২ মাসের (৬০ দিনের) সমান; সর্বমোট ১২ মাস (৩৬০ দিন) বা এক বছরের সওয়াব লাভ হয়ে থাকে। আর এই ভাবে সেই রোযাদারের জীবনের প্রত্যেকটি দিন রোজা রাখা হয়! দয়াময় আল্লাহ বলেন,

)مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا(

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজ করলে, সে তার ১০ গুণ প্রতিদান পাবে। (কুরআনুল কারীম ৬/১৬০)

এই রোজা বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ:

আল্লাহই ভাল জানেন - তা হল ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদার মত। যা ফরয নামাযের উপকারিতা ও তার অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করে। অনুরূপ এই ছয় রোযা রমাযানের ফরয রোযার অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করে এবং তাতে কোন ত্রুটি ঘটে থাকলে তা দূর করে থাকে। সে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির কথা রোযাদার জানতে পারুক অথবা না পারুক।(ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান ৭৬পৃঃ)

তা ছাড়া রমাযানের ফরয রোজা রাখার পর পুনরায় রোজা রাখা রমাযানের রোজা কবুল হওয়ার একটি লক্ষণ। যেহেতু মহান আল্লাহ যখন কোন বান্দার নেক আমল কবুল করেন, তখন তার পরেই তাকে আরো নেক আমল করার তওফীক দান করে থাকেন। যেমন উলামাগণ বলে থাকেন, 'নেক কাজের সওয়াব হল, তার পরে পুনঃ নেক কাজ করা।' (ইতহাফু আহলিল ইসলাম বিআহকামিস সিয়াম ৯২পৃঃ)

এই রোজার উত্তম সময় হল, ঈদের সরাসরি পরের ৬ দিন। কারণ, তাতেই রয়েছে নেক আমলের দিকে সত্বর ধাবমান হওয়ার দলীল। আর এ কথা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর এই উক্তি "যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখার পরে-পরেই শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করে---" থেকে বুঝা যায়।

তদনুরূপ উত্তম হল, উক্ত ছয় রোজাকে লাগাতার রাখা। কেননা, এমনটি করা রমাযানের অভ্যাস অনুযায়ী সহজসাধ্য। আর তাতে হবে বিধিবদ্ধ নেক আমল করার প্রতি সাগ্রহে ধাবমান হওয়ার পরিচয়।অবশ্য লাগাতার না রেখে বিচ্ছিন্নভাবে ও রাখা যেতে পারে।

আশুরার রোজা

আশুরার রোজার প্রধান ফজিলত হলো, এই রোজা রাখলে আল্লাহ্ পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেন। যদিও এখন এটি নফল রোজা, তবুও এর ফজিলত অনেক বেশি এবং রমজানের রোজার পর এটি সর্বোত্তম নফল রোজা হিসেবে বিবেচিত হয়।

হাদীসে আশুরার দিনের অনেক ফলত বিবৃত হয়েছে। এমনকি ইসলামপূর্ব আরব জাহেলী সমাজে এবং আহলে কিতাব- ইহুদী-নাসারাদের মাঝেও ছিল এ দিনের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন-

كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الكَعْبَةُ، فَلَمّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ، قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْه.ُ

(জাহেলী সমাজে) লোকেরা রমযানের রোজা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার দিন রোজা রাখত। এ দিন কাবায় গেলাফ জড়ানো হত। এরপর যখন রমযানের রোজা ফরয হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে এ দিন রোজা রাখতে চায় সে রাখুক। যে না চায় না রাখুক। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৫৯২

এ হাদীসদ্বয় থেকে বুঝে আসে- জাহেলী সমাজে এ দিনের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ দিনে তারা কাবা শরীফে গেলাফ জড়াত। এ দিন ও তারা রোজা রাখত। নবীজীও এ দিন রোজা রাখতেন। হিজরতের পরও এ দিন রোজা রাখতেন। রমযানের রোজা ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনের রোজা ফরয ছিল। রমযানের রোজা ফরয হওয়ার পর এ দিন রোজা রাখা এখন মুস্তাহাব।

এরপর যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন দেখেন, মদীনার আহলে কিতাব ইহুদীরাও এ দিনে রোজা রাখছে। এ দিনকে তারা বিশেষভাবে উদ্যাপন করছে। নবীজী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন-

مَا هَذَا الْيَوْمُ الّذِي تَصُومُونَه؟ُ

এ দিনে তোমরা কী জন্য রোজা রাখছ? তারা বলল-
هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَ وَقَوْمَهُ، وَغَرّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ

এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ দিবস। আল্লাহ তাআলা এ দিনে হযরত মূসা আ. ও তাঁর কওমকে (ফেরাউনের কবল থেকে) মুক্তি দিয়েছেন। এবং ফেরাউনকে তার দলবলসহ (দরিয়ায়) নিমজ্জিত করেছেন। এরপর হযরত মূসা আ. এ দিনে শুকরিয়া আদায় স্বরূপ রোজা রাখতেন। তাই আমরাও রোজা রাখি।

নবীজী এ শুনে বললেন-

فَنَحْنُ أَحَقّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُم.ْ

হযরত মূসা আ.-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তো আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। এরপর নবীজী নিজেও রোজা রাখলেন এবং অন্যদের রোজা রাখতে বললেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩০; সহীহ বুখারী, হাদীস ১১২৫, ৩৯৪৩

ইহুদীদের নিকট এ দিনটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এ দিনটিকে তারা ঈদের মতো উদযাপন করত। হযরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত-

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوهُ أَنْتُم.ْ

আশুরার দিন এমন একটি দিন, যে দিনকে ইহুদীরা সম্মান করত এবং এ দিনকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এ দিনে রোজা রাখ। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩১

এ দিনের রোজার ফযীলতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه.ُ

আশুরার দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা রাখি, তিনি পূর্বের এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন-

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَان.َ

অর্থাৎ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশুরার দিনের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে অন্য কোনো দিন রোজা রাখতে দেখিনি এবং রমযান মাস অপেক্ষা অন্য কোনো মাসে এত গুরুত্ব দিয়ে রোজা রাখতে দেখিনি। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৩২

শা'বান মাসে নফল রোজা

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অবিরাম) রোজা রাখতেন, যার কারণে আমরা বলতাম, আর বাদ দিবেন না। আবার (অবিরাম) রোজাহীনও থাকতেন, যার কারণে আমরা বলতাম, আর রাখবেন না। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পুরো মাস রোজা রাখতে দেখিনি। তেমনি দেখিনি শা'বানের চেয়ে বেশি অন্য কোনো মাসে রোজা রাখতে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫৬

আইয়ামে বীযের রোজা

আইয়ামে বীয তথা প্রত্যেক চান্দ্রমাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখা সুন্নত। এ দিনগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইবনুল মিলহান আলকাইসী রহ. তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال : وقال هن كهيئة الدهر

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আইয়ামে বীয তথা প্রত্যেক চান্দ্রমাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এগুলো সারা রোযার সমতুল্য।-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৪৯

হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا صُمْتَ مِنْ شَهْرٍ ثَلَاثًا، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

তুমি যদি মাসে তিন দিন রোযা রাখ তাহলে তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ ও পনের তারিখ রোযা রেখো। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৪৩৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬১; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৪২৪

ইবনে মাজাহর বর্ণনায় আছে-

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزّ وَجَلّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا فَالْيَوْم بِعَشْرَةِ أَيّامٍ.

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে এর সমর্থন রয়েছে, যে নেক কাজ করবে সে তার দশ গুণ পাবে। তো এক দিন সমান সমান দশ দিন। (দ্র. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭০৮)
১৩৮৮

জিলহজ মাসের রোজা

জিলহজ মাসের প্রথম থেকে নবম দিন পর্যন্ত মোট ৯টি রোজার ব্যাপারে হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর কাছে অন্য কোনো দিনের ইবাদত অতটা বেশি পছন্দনীয় নয়, যতটা বেশি পছন্দনীয় জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের ইবাদত। এর প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছর রোজার সমতুল্য আর এর প্রত্যেক রাতের ইবাদত কদরের রাতের ইবাদতের সমতুল্য। (তিরমিজি, হাদিস : ৭৫৮)
যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর রসুল বলেন, "এই দশদিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়

আর কোন আমল নেই।" (সাহাবাগণ) বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। (আঃ ৩/২৯৮, বুঃ ৯৬৯, আদাঃ ২৪৩৮, তিঃ ৭৫৭, ইমাঃ ১৭২৭নং)

আর রোজা হল একটি নেক আমল। সুতরাং তা পালন করাও এ দিনগুলিতে মুস্তাহাব। (মুমঃ ৬/৪৭১)

আরাফার দিনের রোজা

এটি মুস্তাহাব রোজার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আরাফার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা করি যে, এর বিনিময়ে তিনি ঐ দিনের পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।- সহীহ মুসলিম ১/৩৬৭

এই রোজাটি মূলত হজ আদায়কারী ছাড়া অন্যদের জন্য। কিন্তু বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী হজ আদায়কারী ব্যক্তি রোজার দ্বারা দুর্বল না হলে তার জন্যও উত্তম হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৩৭৫

নিম্নে এসংক্রান্ত দু'টি আছার পেশ করা হল। যেমন:

১. কাসেম ইবনে মুহাম্মদ রাহ. বলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. (হজ করতে গিয়ে) আরফার দিনে রোযা রাখতেন। -মুয়াত্তা মালেক পৃ. ১৪৬৫

২. আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আরাফার দিনে আয়েশা রা.-এর নিকট গেলেন তখন আয়েশা রা. রোযা ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, আপনি ইফতার করুন (রোযা ভাঙ্গুন)। আয়েশা রা. জবাবে বললেন, আমি কীভাবে ইফতার করব। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আরাফার দিনের রোযার বিনিময়ে পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'-মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২৪৭৭০

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা

প্রত্যেক সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা সুন্নত ও মুস্তাহাব। যেহেতু তা ছিল মহানবী
(সা:)এর আমল। আর দিন দুটিতে বিশ্বাধিপতি আল্লাহর নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয়।

উম্মল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেছেন-

كَانَ النبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَحَرّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোজা রাখার ইহতিমাম করতেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়। তো আমার পছন্দ, আমার আমল যেন পেশ করা হয় আমি রোজাদার অবস্থায় । -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৭

উক্ত আবু হুরাইরা হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল বলেছেন, "প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। (এবং বেহেশ্বের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।) আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ আযযা অযাল্ল্ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না যার নিজ ভায়ের সহিত বিদ্বেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশতার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও।" (আঃ ২/৩২৯, মুঃ ২৫৬৫ নং, প্রমুখ)

আবু কাতাদাহ বলেন, 'সোমবার রোজা রাখার ব্যাপারে নবী জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "এটা হল সেই দিন, যেদিনে আমার জন্ম হয়েছে এবং আমার উপর সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে,“ঐ দিনে আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি”।

দাউদী রোজা

যার সামর্থ্য আছে তার জন্য একদিন রোযা থাকা ও তার পরের দিন রোযা না থাকা; ভিন্ন কথায় একদিন পরপর রোযা রাখা মুস্তাহাব। আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় রোযা হল দাউদ-এর রোযা। আর আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় নামায হল দাউদ-এর নামায। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন। অতঃপর তৃতীয় প্রহরে নামায পড়ে পুনরায় ষষ্ঠভাগে ঘুমাতেন, আর তিনি একদিন পানাহার করতেন ও পরদিন রোজা রাখতেন।" (বুঃ১১৩১, মুঃ ১১৫৯নং, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)

পরন্ত মহানবী ইবনে আম্মকে বলেছেন, "তুমি একদিন রোজা থাক এবং একদিন পানাহার কর। এটাই হল দাউদ-এর রোজা; যা সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা।" ইবনে আমর বললেন, 'কিন্তু আমি তার থেকেও উত্তম (প্রত্যেক দিন রোযা রাখতে) পারি।' তা শুনে মহানবী বললেন, "(আমি যা বললাম) তার চাইতে উত্তম কিছুই নেই।" -বুখারী ১৯৭৬

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী তাঁকে বললেন, "দাউদ-এর রোজার উপর কোন রোজা নেই।

অর্ধ বছর রোজা; একদিন রোজা রাখ এবং তার পরের দিন পানাহার কর।"-বুখারী ১৯৮০

বলা বাহুল্য, এ রোজা সামর্থ্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। অতএব শর্ত হল, যেন এ রোজা রাখতে গিয়ে স্বাস্থ্য এমন দুর্বল না হয়ে যায়, যাতে নফল রোজা থেকে উত্তম বা গুরুত্বপূর্ণ আমল পালনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আল্লাহর অন্যান্য হক এবং বান্দার যাবতীয় অধিকার আদায়ে যেন কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশ না পায়। নচেৎ, তা বর্জন করাই উত্তম।

রোজার প্রয়োজনীয় মাসআলা ও মাসায়েল

রমজানের রোজা যাদের উপর ফরজ:

রমযানের চাঁদ উদিত হওয়ার পর প্রত্যেক সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ ও বালেগা) মুকীম, মুসলমান পুরুষ ও হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র মহিলার উপর পূর্ণ মাস রোজা রাখা ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোজা
রাখে। -সূরা বাকারা (২):
১৮৫

নাবালেগ বাচ্চাদের রোজা রাখা

সন্তানদেরকে ৭/৮ বছর বয়স থেকেই নামায-রোযার প্রতি উৎসাহ দেওয়া উচিৎ।এমনকি কেউ কেউ তো সন্তানের বয়স ১৪/১৫ হয়ে গেলেও তাদেরকে রোযা থেকে বিরত রাখেন। এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা হল, সাত বছর বয়সি বাচ্চাদেরকে রোযা রাখার প্রতি চাপাচাপি করা যাবে না। তবে দশ বছরের পর যখন থেকে দু-একটি করে রোযা রাখার ব্যাপারে শারীরিকভাবে সক্ষম হয়, তখন থেকে কিছু কিছু রোজা রাখতে উৎসাহিত করবে। আর বালেগ হওয়ার পরই যেহেতু তার উপর পুরো রমযান রোজা রাখা আবশ্যক হয়ে যায় তাই সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে বারো-তেরো বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়-দশ বছর বয়সেই রোযার প্রতি অভ্যস্ত করে তুলবে। যেন বালেগ হওয়ার পর পূর্ণ রোযা রাখতে সমস্যা না হয়। -মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ৭২৯৩, ৭২৯৪; ফাতাওয়া শামী ২/৪০৯

সাহাবায়ে কেরাম রা. তাঁদের সন্তানদেরকে রোজা রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। রুবায়্যি‘ বিনতে মুআওয়াজ রা. বলেন, আমরা নিজেরা আশুরার রোজা রাখতাম এবং আমাদের বাচ্চাদেরকেও রোজা রাখাতাম। তাদের জন্য পশমের তৈরি খেলনা রাখতাম। যখন বাচ্চাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদত তখন তাকে খেলনা দিতাম, এভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৬০

চাঁদ সংক্রান্ত মাসআলা

চাঁদ দেখা ফরযে কেফায়া

২৯ শাবান সূর্যাস্তের পর রমযানের চাঁদ অন্বেষণ করা ফরযে কেফায়া। মারাকিল ফালাহ ৩৫৪

নতুন চাঁদ দেখার দুআ

যেকোনো মাসের নতুন চাঁদ, এমনকি রোযা ও ঈদের চাঁদ দেখার দুআ একটিই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখলে এই দুআ পড়তেন-

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ.

(উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলয়ুমনি ওয়াল ঈমান, ওয়াসসালামাতি ওয়াল ইসলাম। রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।)

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এই চাঁদকে সৌভাগ্য ও ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে উদিত করুন। আল্লাহই আমার ও তোমার রব। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৯৭; -জামে তিরমিযী, হাদীস, ৩৪৫১

যখন রমযানের রোজা রাখা অবশ্যক হবে

মাসআলা: রমযানের চাঁদ উদিত হওয়া প্রমাণিত হলেই সকলের জন্য রোজা রাখা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ শাবানের ২৯ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ উদিত হওয়া প্রমাণিত হলে পরদিন থেকে রোযা রাখতে হবে। নতুবা শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করার পর রোজা শুরু করবে।

হাদীস শরীফে আছে-

لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له.

অর্থ: তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখে রোজা শুরু করবে এবং (ঈদের) চাঁদ দেখে রোযা ছাড়বে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় (এবং চাঁদ দেখা না যায়) তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। অর্থাৎ আকাশ পরিচ্ছন্ন না থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করে রমযানের রোজা রাখা শুরু করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৮০/৩

মাসআলা: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এমন এক ব্যক্তির চাঁদ দেখাই যথেষ্ট, যার দ্বীনদার হওয়া প্রমাণিত অথবা যে বাহ্যিকভাবে দ্বীনদার হিসেবে পরিচিত। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৪০; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৪৫৮১; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮৫

মাসআলা: আকাশ পরিষ্কার থাকলে একজনের খবর যথেষ্ট নয়। বরং এত বেশি সংখ্যক লোকের খবর প্রয়োজন, যার দ্বারা প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, চাঁদ দেখা গেছে। কেননা যে বিষয়ে অনেকের আগ্রহ ও সংশ্লিষ্টতা থাকে তাতে দু'একজনের খবরের উপর নির্ভর করা যায় না। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৮৮; রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৮

শাবান মাসের ২৯ ও ৩০তম দিন রোজা রাখা

মাসআলা: শাবান মাসের ২৯ ও ৩০তম দিন রোযা রাখা মাকরূহ। নফলের নিয়তেও রোযা রাখা যাবে না। আবার যদি রমযান হয় তাহলে রমযানের রোযা নতুবা নফল রোযা এমন নিয়তেও রোযা রাখা যাবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই কোনো নির্দিষ্ট দিবসে যেমন, সোমবার ও মঙ্গলবার-এ নফল রোযা রেখে আসছে এবং ঘটনাক্রমে ২৯ ও ৩০ তারিখে ঐ দিন পড়েছে তার জন্য এই তারিখেও নফল রোযা রাখা জায়েয। -হাশিয়াতুত ৫৮ ত্বহত্বী আলাদ্দুর ১/৪৪৪, ইলাউস সুনান ৯/২২৪-২২৭

হাদীস শরীফে আছে,
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
অর্থ: (নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) তোমরা রমযান মাসের একদিন বা দুই দিন পূর্ব থেকে রোযা রেখো না। তবে কারো যদি আগে থেকেই কোনো নির্দিষ্ট দিন রোযা রাখার অভ্যাস থাকে এবং ঘটনাক্রমে সে দিনটি ২৯ ও ৩০ শাবান হয় তাহলে সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯১৪; জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৮৪

রোজার নিয়ত

মাসআলা: রোযার নিয়ত করা ফরয। নিয়তের অর্থ অন্তরের সংকল্প। যেমন মনে মনে এভাবে সংকল্প করবে যে, 'আমি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আগামীকাল রোযা রাখব'। নিয়তের জন্য অন্তরের সংকল্পই যথেষ্ট, মুখে বলা জরুরি নয়। তবে মুখে বলা ভালো। -বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৫; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫

মাসআলা: আরবী নিয়ত জরুরি নয়, উত্তমও নয়। আরবী নিয়তে পৃথক কোনো সওয়াবও নেই। তাই নিজ ভাষায় নিয়ত করবে।

মাসআলা: রোজার উদ্দেশ্যে সাহরী খেলে সেটিই রোযার নিয়তের জন্য যথেষ্ট। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫

রমযানের রোজার নিয়ত যখন করবে?

ফরয রোজার নিয়ত রাতেই করা উত্তম।

উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ.

যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযা রাখার নিয়ত করবে না তার রোযা (পূর্ণাঙ্গ) হবে না। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৫৪; আলবাহরুর রায়েক ২/২৫৯-২৬০; বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৯

মাসআলা: রাতে নিয়ত করতে না পারলে যাহওয়াতুল কুবরা (অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্তের ঠিক মধ্যবর্তী সময়)-এর আগে নিয়ত করলেও রোজা হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল সুবহে সাদিকের পর থেকে রোজা ভঙ্গকারী কোন বিষয় সংঘটিত না হওয়া। এর চেয়ে বিলম্বে নিয়ত করলে সে রোযা সহীহ হবে না। বিশিষ্ট তাবেয়ী আব্দুল কারীম জায়াবী রাহ. বলেন, কিছু লোক সকালে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন উমর ইবনে

আব্দুল আযীয রাহ. বললেন, 'যে ব্যক্তি (ইতিমধ্যে কিছু) খেয়েছে সে বাকি দিন খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর যে খায়নি সে বাকি দিন রোজা রাখবে।' -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯১৭১, ৯১৮১

প্রকাশ থাকে যে, এক্ষেত্রে ফিকহের কোন কোন কিতাবে এবং লোকমুখে, সূর্য ঢলার আগে নিয়ত করলেও হবে বলে যে কথা প্রসিদ্ধ আছে তা সহীহ নয়। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৬; রদ্দুল মুহতার ২/৩৭৭

নফল ও কাযা রোযার নিয়তের সময়

মাসআলা: নফল রোযার ক্ষেত্রেও সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্তের ঠিক মধ্যবর্তী সময় এর আগে নিয়ত করলেও রোযা হয়ে যাবে। তবে রমযানের কাযা রোযার জন্য রাতেই অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্বেই নিয়ত করা জরুরি।

সুবহে সাদিকের পরে কাযা রোযার নিয়ত করা সহীহ নয়। তাই সুবহে সাদিকের পরে কাযা রোযার নিয়ত করলে তা নফল হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬৪; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮০

মাসআলা: সুবহে সাদিকের পর রোযার নিয়তের আগে ভুলে খেয়ে ফেললে
সকাল হওয়ার পর নফল রোযার নিয়ত করার অবকাশ থাকলেও সুবহে সাদিকের পর ভুলে কোন কিছু খেয়ে ফেললে ঐদিন আর রোযার নিয়ত করা যায় না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৬

পুরো রমযানের জন্য একত্রে নিয়ত করা

পুরো রমযানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক রোযার জন্য প্রতিদিন পৃথক পৃথক নিয়ত করতে হবে। কারণ প্রতিটি রোযা ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত। আর প্রতিটি আমলের জন্যই নিয়ত জরুরি। হাদীস শরীফে আছে, 'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।' রদ্দুল মুহতার ২/৩৮০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫

রাতে রোযার নিয়ত করার পর পানাহার করা

রাতে রোযার নিয়ত করার পরও সুবহে সাদিক পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া ও স্ত্রী মিলন জায়েয। এতে নিয়তের কোনো ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

অর্থ: তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে রমযানের রাতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে প্রবৃত্ত হওয়া। -সূরা বাকারা (২): ১৮৭

নিয়তের সময় যখন শুরু হয়?

নিয়তের সময় শুরু হয় পূর্বের দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে। যেমন-মঙ্গলবারের রোযার নিয়তের সময় সোমবার দিবাগত রাত তথা সূর্যাস্তের পর থেকে আরম্ভ হয়। সুতরাং সোমবার সূর্যাস্তের আগে মঙ্গলবারের রোযার নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। কেননা হাদীসে রাতে নিয়ত করার কথা বলা হয়েছে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৩; রদ্দুলমুহতার ২/৩৭৭

রোযার নিয়ত করার আগেই কেউ অজ্ঞান অথবা পাগল হয়ে গেলে

রোযার নিয়ত করার আগেই যদি কেউ অজ্ঞান অথবা পাগল হয়ে যায় এবং নিয়তের শেষ সময় অর্থাৎ যাহওয়াতুল কুবরার (সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ের) আগে সুস্থ না হয় তাহলে সে অনাহারে থাকলেও তার রোযা হবে না। পরবর্তীতে এ রোযার কাযা করতে হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৬

সাহরী

সাহরী খাওয়া সুন্নত

মাসআলা: সাহরী খাওয়া সুন্নত। পেট ভরে খাওয়া জরুরি নয়, এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নত আদায় হবে। হাদীস শরীফে আছে,

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تسحروا، فإن في السحور بركة.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা সাহরী খাও। কেননা, সাহরীতে বরকত রয়েছে।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৯৫

অন্য হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

السحور أكله بركة ، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين.

অর্থ: সাহরী খাওয়া বরকতপূর্ণ কাজ। সুতরাং তোমরা তা ছেড়ে দিও না। যদিও এক ঢোক পানি দিয়ে হোক না কেন। কারণ যারা সাহরী খায় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১১০৮৬

সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে সাহরী খাওয়া

সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। তবে এত দেরি করা মাকরূহ যে, সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়।

হযরত আবুদুল্লাহ ইবেন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن ابن عباس رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا معاشر الأنبياء امرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا

অর্থ: 'সকল নবীকে (সময় হয়ে গেলে দেরি না করে) তাড়াতাড়ি ইফতার করতে আদেশ করা হয়েছে এবং সাহরী বিলম্বে খেতে বলা হয়েছে।' -আলমুজামুল আওসাত ২/৫২৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৩৬৮

আমর ইবনে মায়মুন আলআওদী বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম (সময় হয়ে যাওয়ার পর) তাড়াতাড়ি ইফতার করে নিতেন আর সাহরী বিলম্বে খেতেন।' -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৫৯১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯০২৫

আযান শুনে সাহরী খাওয়া বন্ধ করা

অনেকে আযান শুনে সাহরী খাওয়া বন্ধ করে। এটা ঠিক নয়। এমনটি করলে রোজা সহীহ হবে না। কেননা আযান দেওয়া হয় সুবহে সাদিক অর্থাৎ ফযরের ওয়াক্ত হওয়ার পর। আর সাহরী খাওয়ার শেষ সময় হল সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত। সুতরাং আযানের আগে এমনকি ফযরের ওয়াক্তের আগেই অবশ্যই সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

ইফতার

সূর্যাস্তের পরপরই দেরি না করে ইফতার করা মুস্তাহাব

মাসআলা: হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

অর্থ: যতক্ষণ মানুষ দেরি না করে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করবে ততক্ষণ তারা কল্যাণের উপর থাকবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৫৭

মাসআলা: মাগরিবের নামায পড়ার আগে ইফতার করে নিবে, যেন সূর্যাস্তের পর তাড়াতাড়ি ইফতার করার সওয়াব পাওয়া যায়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়ার আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনা খেজুর দ্বারা, তা-ও না পেলে কয়েক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।' -সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৬৯২

খেজুর দ্বারা ইফতার করা

মাসআলা: খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার শুরু করবে। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বলেন,

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا، فَلْيُفْطِرْ عَلَى ماءٍ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ

অর্থ: 'যার কাছে খেজুর আছে সে খেজুর দ্বারা ইফতার করবে খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা পানি হল অতি পবিত্র।' -সুনানে তিরমিযী, হাদীস ৬৯৪

মাসআলা: পানাহারে যথাসম্ভব সংযমী হওয়া উচিত। ইফতার ও সাহরীতে প্রয়োজনের চেয়ে কিছু কম খাওয়ার দ্বারাও রোযা শক্তিশালী এবং অধিক পরিপূর্ণ হয়। আর অধিক পানাহারে

অনেক সময় মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলো শক্তিশালী হয় এং তাকে নানাবিধ পাপকার্যে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ইফতার ও সাহরীতে কম খাওয়ার দ্বারা কু-প্রবৃত্তি প্রশমিত হয়।

ইফতারের দুআ

মাসআলা: ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে বেশি বেশি দুআ-ইস্তিগফার করা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে, ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৭৫৩

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. ইফতারের সময় এ দুআপড়তেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার ঐ রহমতের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যা সকল বস্তুতে পরিব্যপ্ত, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৭৫৩

ইফতারের সময় হাদীসে এ দুআ পড়ার কথা এসেছে-

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْت ُ
وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ُ

অর্থ: হে আল্লাহ আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই রোজা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করেছি। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ২৩৫৮

ذَهَبَ الظَّمَأُইফতারের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পড়তেন-
وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ ُ
وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ُ

অর্থ: পিপাসা নিবারিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা শিক্ত হয়েছে। আর আল্লাহ চাহেন তো রোজার সওয়াবও লেখা হয়েছে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৫৭

কেউ ইফতার করালে যে দুআ পড়বে

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ঘরে ইফতার করার পর তাদের জন্য এভাবে দুআ করতেন-

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ.

অর্থ: তোমাদের নিকট যেন রোযাদারগণ ইফতার করেন তোমাদের খাবার যেন পুণ্যবান লোকেরা আহার করেন এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্য রহমতের দুআ করেন। - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৫৪

প্রকাশ থাকে যে, ইফতার ছাড়া অন্য সময়ের দাওয়াত গ্রহণ করলে তখন দুআটি এভাবে পড়ার কথা হাদীসে আছে,

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ

অর্থ: তোমাদের খাবার যেন পুণ্যবান লোকেরা আহার করেন, ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্য রহমতের দুআ করেন এবং তোমাদের নিকট যেন রোযাদারগণ ইফতার করেন। - সুনানে কুবরা, বায়হাকী হাদীস ১৪৬৭৩

কাফফারা-সংক্রান্ত মাসায়েল

রমযান মাসে রোজা রেখে কেউ যদি বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত ভেঙে ফেলে তাহলে তাকে ঐ রোজার কাযা ছাড়াও কাফ্ফারা হিসেবে ধারাবাহিক দুই মাস বা লাগাতার ৬০ দিন রোযা রাখতে হবে। এটাকে কাফফারার রোজা বলে।

যেসব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি

মাসআলা: রমযানে রোজা রেখে কোনো প্রকার শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে কাযা-কাফফারা দু'টোই জরুরি। হাদীস শরীফে আছে,

عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রমযানে রোজা রেখে (ইচ্ছাকৃত) পানাহার করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করলেন, যেন একটি দাস আযাদ করে বা দুই মাস রোযা রাখে বা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ায়। -সুনানে দারাকুতনী ২/১৯১, হাদীস ২৩০৮; মাবসূত সারাখসী ৩/৭৮; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৯-৪১০

মাসআলা: রমযানে রোজা রেখে দিনে স্ত্রী সহবাস করলে বীর্যপাত না হলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৯

একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমি রোজা রেখে স্ত্রী সহবাস করেছি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাফফারা আদায়ের আদেশ দেন। -সহীহ বুখারী ৬৭০৯; জামে তিরমিযী ৭২৪

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে (যে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল) কাফফারা আদায়ের সাথে কাযা আদায়েরও আদেশ করেন। -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৪৬১ উল্লেখ্য, কাযা ও কাফফারার ক্ষেত্রে অবৈধ বা হারাম মিলনের বিধানও একই। যদিও হারাম হওয়ার কারণে এর গুনাহ অনেক বেশি। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৯

মাসাআলা: বিড়ি, সিগারেট ও হুক্কা পান করলেও রোজা ভেঙে যাবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫ (বিস্তারিত দলিলের জন্য দেখুন: আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী রাহ.কৃত 'তারবীহুল জিনান বিতাশরীহী হুকমি শুরবিদ দুখান', পৃষ্ঠা: ৬৯; মাজমুআতু রাসাইল ২/৩১৯)

মাসআলা: সুবহে সাদিক হয়ে গেছে এ কথা জানা সত্ত্বেও আযান শোনা যায়নি বা সম্পূর্ণরূপে আলো হয়নি এ ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে ইচ্ছাকৃত খানাপিনা করলে বা স্ত্রী সহবাস করলে কাযা ও কাফফারা দু'টোই জরুরি হবে।

কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি

মাসআলা: একটি রোযার পরিবর্তে ধারাবাহিক দুই মাস রোযা রাখতে হবে। চান্দ্রমাসের ১ম তারিখ থেকে কাফফারার রোযা শুরু করলে দু মাস রোযা রাখলেই চলবে। যদিও উভয় মাস বা কোনো এক মাস ২৯ দিনের হয়। আর যদি চাঁদের ১ম তারিখ থেকে শুরু করা না হয় তাহলে ধারাবাহিক ৬০টি রোযা রাখতে হবে।

মাসআলা: যদি কারো স্থায়ী অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে ধারাবহিক দুই মাস রোযা রাখার সামর্থ্য না থাকে তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে দুই বেলা পেট পুরে খাওয়াতে হবে অথবা ৬০ জনকে এক ফিতরা সমান (পৌনে দু কেজি গম বা তার মূল্য) সদকা দিতে হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯৩৭; শরহু মুখতাছারিত ত্বহাবী ২/৪১৯

মাসআলা: একজন মিসকীনকে ৬০ দিন দু বেলা তপ্তি সহকারে খাওয়ালে অথবা ৬০টি সদকা ফিতরের সমপরিমাণ মূল্য দিলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫১৩

মাসআলা: কাফফারা আদায় করার ক্ষেত্রে ৬০ জনের টাকা বা ৬০ জনের খাবার ৬০ জনকে যেমন দেওয়া যায় তদ্রুপ ৬০ জনেরটা একজন দু'জনকে দেওয়াও বৈধ। তবে শর্ত হল, একদিনে একজনকে একদিনের টাকাই দেওয়া যাবে। দুই-তিন দিনের টাকা বা খাবার এক সাথে দেওয়া যাবে না। -আদ্দুররুল মুখতার ৩/ ৩৭৮-৩৮০

মাসআলা: খাদ্য, বস্ত্র বা টাকা দিয়ে কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে পুরো কাফফারা একজন দু'জনকে একদিন একদিন করে দেওয়া হোক অথবা ৬০ জনকেই দেওয়া হোক সেটা একসাথে লাগাতার হওয়া জরুরি নয়। বরং মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে দু'জন তিনজন করে দিয়ে ৬০ জন পূর্ণ করলেও তা সহীহ হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৬০-১৬১; আদ্দুররুল মুখতার ৩/৩৭৮-৩৮০

মাসআলা: পূর্ণ খাবার খেতে পারে না এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদেরকে খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫১৪

মাসআলা: লাগাতার দুই মাস রোযা রাখার শক্তি-সামর্থ্য থাকলে রোযাই রাখতে হবে। তা না করে ৬০ জনকে খাওয়ালে কাফফারা আদায় হবে না। -সহীহ মুসলিম ১/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৫ আদ্দুররুল মুখতার ২/৪১২

মাসআলা: দুই মাস রোযা রাখতে গিয়ে কোনো ওজরেও (যেমন, ঈদের কারণে বা অসুস্থতার কারণে) যদি ধারাবাহিকতা ছুটে যায় তাহলে নতুন করে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে পিছনের রোযাগুলো কাফফারার রোযা হিসেবে ধর্তব্য হবে না। ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেন, 'যার উপর কাফফারা হিসাবে দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা জরুরি সে যদি মাঝে অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা ভেঙে ফেলে তাহলে নতুন করে রোযা রাখা শুরু করবে।' -আলমুহাল্লা ৪/৩৩১

মাসআলা: কাফফারার রোযা রাখার সময় মহিলাদের হায়েযের কারণে ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে আরম্ভ করতে হবে না। তারা পবিত্র হওয়ার
পরপরই আবার রোযা শুরু করে দিবে। পবিত্র হওয়ার পর কোনো দিন যদি রোযা না রাখে তাহলে কাফফারা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে নতুন করে লাগাতার ষাট দিন রোযা রাখতে হবে। তবে নিফাসের (সন্তান প্রসব পরবর্তী স্রাব) কারণে ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে নতুন করে শুরু করতে হবে। -কিতাবুল আসল ২/১৫৮-১৬০; রদ্দুল মুহতার ২/৪১২

মাসআলা: একই রমযান অথবা একাধিক রমযানের কয়েকটি রোযা ভেঙে ফেলার কারণে একাধিক কাফফারা ওয়যাজিব হলে সবগুলোর জন্য একটি কাফফারা আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। আর যে কয়টি রোযা ভেঙ্গেছে কিংবা একেবারেই রাখেনি সেগুলোর হিসাব করে প্রত্যেকটির জন্য একটি করে রোযা কাযা করতে হবে। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২৫৪; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৬; ফাতহুল কাদীর ২/২৬১

মাসআলা: কাফফারার রোযা এমন সময় শুরু করতে হবে যেন তার মধ্যে নিষিদ্ধ দিনগুলো না পড়ে। তথা শাওয়ালের ১ তারিখ অথবা যিলহজ্বের ১০ থেকে ১৩ তারিখ, এ দিন গুলো না আসে। কাফফারা আদায়ের দু'মাসের ভিতরে উক্ত নিষিদ্ধ দিনগুলো পড়লে সে দিনগুলোতে রোযা রাখলেও কাফফারা আদায় হবে না এবং উক্ত দিনগুলো বাদ দিয়ে দু'মাস পূর্ণ করলেও কাফফারা আদায় হবে না বরং এক্ষেত্রে পুনরায় নতুন করে লাগাতার দু'মাস রোযা রাখতে হবে। -মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস ১১৫১৯; আলবাহরুর রায়েক ৪/১০৫; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৩৪

রোজার কাযা-সংক্রান্ত মাসায়েল

যেসব কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয় কাফফার ওয়াজিব হয় না-

মাসআলা: অযু বা গোসলের সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত গলার ভিতরে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। সুফিয়ান সাওরী রাহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, রোযা অবস্থায় কুলি করতে গিয়ে (অনিচ্ছাকৃত) গলার ভেতর পানি চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে এবং তা কাযা করতে হবে। -মুসান্নাফে আবুদুর রাযযাক হাদীস ৭৩৮০; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯৮৪৪; কিতাবুল আসল ২/১৫০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৭৮

ইবরাহীম নাখয়ী রাহ. বলেন, 'রোযা অবস্থায় কুলি করার সময় অথবা নাকে পানি দেওয়ার সময় যদি পানি ভিতর প্রবেশ করে এবং তা গলায় চলে যায় তবে সে ঐ দিনের রোযা পূর্ণ করবে এবং পরে তা কাযা করে নিবে। -কিতাবুল আসার, হাদীস ২৮৭

প্রকাশ থাকে যে, পানি যদি শুধু নাকে প্রবেশ করে, গলায় না পৌঁছে তবে রোযা ভাঙবে না। আর রোযা অবস্থায় অযু-গোসলের সময় নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে না। তেমনিভাবে গড়গড়াও করবে না।

মাসআলা: দাঁতের ফাঁকে থেকে যাওয়া (একটি ছোলা বা তার অধিক পরিমাণ) খাবার গিলে ফেললে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে। আর ছোলা পরিমাণের চেয়ে কম হলে রোযা ভাঙবে না। -মাবসূত, সারাখসী ৩/৯৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২

মাসআলা: অন্যের হুমকিতে বাধ্য হয়ে রোযা ভঙ্গের কোনো কাজ করলেও রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা করতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪০১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৯৩

মাসআলা: ঘাম অথবা চোখের পানি যদি এত বেশি পরিমাণে মুখে প্রবেশ করে যে, গলার ভিতর স্বাদ অনুভূত হয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা করতে হবে। কিন্তু গলায় স্বাদ না পেলে বরং শুধু মুখে স্বাদ পাওয়া গেলে রোযা ভাঙবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে কাযাও করতে হবে না। -আলমুহীতুল বরহানী ৩/৩৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

মাসআলা: অসাবধানতাবশত কোনো খাদ্য বা পানীয় অনিচ্ছাকৃত গলার ভিতর চলে গেলেও রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা করতে হবে। -আলবাহরুর রায়েক ২/২৭১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২

মাসআলা : যা সাধারণত আহারযোগ্য নয় বা কোনো উপকারে আসে না, তা খেলেও রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা করতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও ইকরিমা রাহ. বলেন, (পেটে) কোনো কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙে যায়। কোনো কিছু বের হওয়ার দ্বারা রোযা ভাঙে না। –সহীহ বুখারী ১/২৬০ (তা'লীক); বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৫; রদ্দুল মুহতার ২/৪১০

মাসআলা: ইচ্ছাকৃত মুখভরে বমি করলে রোযা ভেঙে যাবে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কোনো ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হলে তাকে সে রোযার কাযা করতে হবে না (অর্থাৎ তার রোযা ভাঙবে না) আর যে ইচ্ছাতকৃত (মুখ ভরে) বমি করবে সে যেন রোযা কাযা করে। -জামে তিরমিযী, হাদীস: ৭২০

মাসআলা : মুখে বমি চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা ভেঙে যাবে। যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়। –আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৪; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪১৫

মাসআলা: আগরবাতি ইত্যাদির ধোঁয়া ইচ্ছাকৃত গলার ভিতরে প্রবেশ করালে রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা করতে হবে। কিন্তু কেউ দি ইচ্ছাকৃত উক্ত ধোয়া টেনে না নেয় বরং সাধারণভাবে ঘ্রাণ নাকে যায় কিংবা এমনিতেই ধোয়া চলে যায় তাহলে রোযা ভাঙবে না। -রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫

মাসআলা: রোযা অবস্থায় হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা ভেঙে যাবে। পরে সে রোযাটিও কাযা করতে হবে। -শরহু মুখতাছারিত ত্বহাবী ২/৪৪০

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় নারীদের লক্ষ করে বললেন–

...أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

নারীরা কি ঋতুস্রাবের সময় রোযা ও নামায থেকে বিরত থাকে না।
নারীরা বলল, অবশ্যই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই তাদের দ্বীনের অসম্পূর্ণতা। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০৪; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৪৪০; আননুতাফ ফিল ফাতাওয়া, পৃ. ১০০

মাসআলা: পেটের এমন ক্ষতে ওষুধ লাগালে রোযা ভেঙে যাবে যে ক্ষত দিয়ে ওষুধ পেটের ভিতরে চলে যায়। বিশেষ প্রয়োজনে এমন ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগালে পরে সে রোযার কাযা করে নিতে হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪; যাবিতুল মুফাততিরাত, পৃষ্ঠা: ৫৭

মাসআলা: সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, কিন্তু না জেনে সাহরীর সময় আছে মনে করে পানাহার বা স্ত্রী সঙ্গম করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আউন রাহ. থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহ. রাত্র বাকি আছে ভেবে সাহরী খেলেন। তারপর জানতে পারলেন, তিনি সুবহে সাদিকের পর সাহরী করেছেন তখন তিনি বললেন, 'আমি আজ রোযাদার নই।' (অর্থাৎ আমাকে এ রোযার কাযা করতে হবে)। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯১৩১

মাসআলা: ইফতারির সময় হয়ে গেছে ভেবে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতারি করে নিলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং উভয় ক্ষেত্রে কাযা করতে হবে। হযরত হানযালা রা.বলেন, আমি রমযান মাসে উমর রা. এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেখানে কিছু পানীয় পেশ করা হল এবং কেউ কেউ সূর্য ডুবে গেছে মনে করে তা পান করল। তখন মুয়ায্যিন উচ্চস্বরে বললেন আমীরুল মুমীনিন আল্লাহর কসম সূর্য এখনো ডোবেনি, তা উদিত অবস্থায় আছে। তখন উমর রা. বললেন, যারা ইফতার করে ফেলেছে তারা যেন তার পরিবর্তে আরেকটি রোযা রাখে আরা যারা ইফতার করেনি তারা যেন সূর্য ডুবা পর্যন্ত তা পূর্ণ করে। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/১৪৯, হাদীস ৯১৩১; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৫

মসাআলা: কেউ রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করার পর রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং শুধু কাযা করা জরুরি হবে। -শরহু মুখতাছারুত ত্বহাবী ২/৪৬৩

মাসআলা: বমি হওয়ার কারণে রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে রোযা ভেঙ্গে ফেললে শুধু কাযা করতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪০১

যেসব কারণে রোযা ভাঙে না, ক্ষতিও হয় না

এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলোর কারণে রোজা ভাঙে না। এমনকি রোজার কোনো ক্ষতিও হয় না। অথচ সেগুলোকে কেউ কেউ রোজা ভঙ্গের কারণ মনে করে। ফলে এমন কোনো কাজ হয়ে গেলে রোজা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করে ফেলে। আবার কেউ কেউ এ সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে তা পরিহার করতে গিয়ে অনাবশ্যক কষ্ট ভোগ করে। অতএব এসব বিষয়েও সকল রোজাদারের অবগত হওয়া জরুরি।

মাসআলা: কোনো রোজাদার তার রোজার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে তার রোযা নষ্ট হবে না। তবে রোজা স্মরণ হওয়ামাত্র এ পনাহার বা রোজাভঙ্গকারী বস্তু পরিহার করতে হবে। -শরহু মুখতাছারিত ত্বহাবী ২/৪১১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২০

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.

অর্থ: যে ব্যক্তি ভুলে আহার করল বা পান করল সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহ তাকে পানাহার করিয়েছেন। -সহীহ
মুসলিম ১/৩৬৪, হাদীস ১১৫৫

মাসআলা: রোজাদারকে ভুলে খেতে দেখলে তাকে রোজার কথা স্বরণ করিয়ে দিবে। তবে দেখে যদি অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষুধার্ত মনে হয় তাহলে স্বরণ করাবে না। -ফাতহুল কাদীর ২/২৫৫, ফাতাওয়া খানিয়া ১/২০৪ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৫

মাসআলা: চোখে ওষুধ, ড্রপ কিংবা সুরমা ইত্যাদি লাগালে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। এক্ষেত্রে ওষুধের স্বাদ গলায় অনুভব করলেও রোজা ভাঙবে না।
জামে তিরমিযী, হাদীস ৭২৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৪/২০৭-২০৮:ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

বর্ণিত আছে, হযরত আনাস রা. রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৭৮

মাসআলা: রাতে গোসল ফরয হয়েছে, কিন্তু গোসল করা হয়নি এবং এ অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেছে: এতে রোজার কোন ক্ষতি হবে না। অবশ্য রোজা অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ অপবিত্র থাকা উচিত নয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস
১৯৩১: সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০০৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০০

মাসআলা: অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলেও রোযা ভাঙে না। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

من ذرعه القيء فليس عليه القضاء

অর্থ: যে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বমি হয় তাকে উক্ত রোজার কাযা করতে হবে না। (অর্থাৎ তার রোজা ভাঙবে না)। -জামে তিরমিযী ১/১৫৩, হাদীস ৭২০

তদ্রূপ রোযাদার ব্যক্তির যদি অনিচ্ছায় অল্প পরিমাণ বমি মুখে চলে আসে অতঃপর তা আবার ভিতরে চলে যায়, তাহলেও ঐ ব্যক্তির রোযা নষ্ট হবে না। -ফাতহুল কাদীর ২/২৬০; ফাতাওয়া খানিয়া ১/২১১ রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪

মাসআলা: ঢেকুরের সাথে অল্প খাবার মুখে চলে আসার পর নিজ থেকেই তা পেটে চলে গেলে রোজা নষ্ট হবে না। তবে কখনো ঢেকুরের সাথে খাবার মুখে চলে আসলে তা গিলে ফেলবে না; বরং অবশ্যই ফেলে দিবে। -আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৫৬; ফাতহুল কাদীর ২/২৫৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪

মাসআলা: দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা ছোলার দানার চেয়েও কম পরিমাণ খাবার গিলে ফেললে রোজা ভাঙবে না, তবে মাকরূহ হবে। হ্যাঁ, ছোলার চেয়ে কম পরিমাণে খাবারও মুখ থেকে বের করে পুনরায় গিলে ফেললে রোজা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৮; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৫

মাসআলা:ধোঁয়া বা ধুলাবালি অনিচ্ছাকৃত গলা বা পেটের ভিতর চলে গেলে রোযা ভাঙবে না। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯৮৮৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

মাসআলা: মাছি কিংবা কীটপতঙ্গ অনিচ্ছাকৃত পেটের ভিতর ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'কারো গলায় মাছি ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না।' -সহীহ বুখারী ১/২৫৯: মুসান্নাফ ইবনে আত্মীশাইবা ৬/৩৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

মাসআলা: কুলি করার পর সাধারণত মুখে যে পানি লেগে থাকে তা রোজা অবস্থায় থুথুর সাথে গিলে ফেললে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৬

মাসআলা: স্বপ্নদোষের কারণে রোজা ভাঙে না। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ ভরে বমি হল। তিনি তখন বললেন, তিনটি বস্তু রোজা ভঙ্গের কারণ নয়। বমি, শিঙ্গা লাগানো ও স্বপ্নদোষ। -সুনানে কুবরা বাইহাকী ৪/২৬৪; জামে তিরমিযী, হাদীস: ৭১৯; কিতাবুল আসল ২/১৪৫; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬

মাসআলা: মাথায় বা শরীরে তেল ব্যবহার করলে রোজার ক্ষতি হয় না। -মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৪/৩১৩; আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৫

মাসআলা: চোখের দু'এক ফোটা পানি মুখে চলে গেলে রোজার ক্ষতি হয় না। তবে যদি মুখে এত বেশি পরিমাণ অশ্রু চলে যায় যে, পুরো মুখে অশ্রুর লবণাক্ততা অনুভূত হয় এবং রোজাদার তা গিলে ফেলে তাহলে রোজা ভেঙে যাবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪০৩-৪০৪

মাসআলা: রতি-ক্রিয়া ছাড়া শুধু কল্পনার কারণে শুক্রক্ষরণ হলে রোজা ভঙ্গ হয় না। তবে রোজা অবস্থায় কু-চিন্তা অবশ্যই গর্হিত কাজ। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৬

মাসআলা: কামভাবে কোনো মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করার ফলে কোনো ক্রিয়া ছাড়াই বীর্যপাত হলে রোজা ভাঙবে না। তবে রোজা অবস্থায় স্ত্রীর দিকেও এমন দৃষ্টিতে তাকানো অনুচিত।

আর অপাত্রে কুদৃষ্টি তো গুনাহ, যা রোজা অবস্থায় আরো ভয়াবহ। এটা রোযার ফযীলত ও বরকত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/২৫৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪: আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫১

মাসআলা: সাহরীর সময় পান খেলে ভালোভাবে কুলি করে নিতে হবে। যাতে পান-সুপারির কোনো অংশ মুখে না থাকে। এরপরও থুথুতে লালচে ভাব থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। এর কারণে রোজা ভাঙ্গবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২০৩

মাসআলা: সুস্থ অবস্থায় রোজার নিয়ত করার পর যদি অজ্ঞান, অচেতন কিংবা পাগল হয়ে যায় তাহলে ঐ রোযা নষ্ট হবে না, বরং তা আদায় হয়ে যাবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৬৮ আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৭১

মাসআলা: রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। এবং সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত বের করলেও রোজা ভাঙে না। তাই রোজা অবস্থায় ব্লাড টেস্ট করা যাবে। এতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে রোজা অবস্থায় ডোনার হিসেবে কোনো রুগীকে রক্ত দেওয়া ঠিক নয়, যার কারণে রোজা রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা হয় বা রোজা অধিক কঠিন হয়ে পড়ে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৩৯

সুতরাং রোজা অবস্থায় প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া যাবে। তবে রক্ত দেওয়ারকারণে যদি এত দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয় যে, রোযা পূর্ণ করতেপারবে না। তাহলে তার জন্য রক্ত দেওয়া মাকরূহ। -ফাতাওয়া
তাতারখানিয়া ২/৩৭৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫

মাসআলা: দাঁত থেকে রক্ত বের হওয়া রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। তবে রোজা অবস্থায় রক্ত বের হলে তা যেন গলায় চলে না যায় সেদিকে খেয়ালরাখতে হবে। গলায় যদি রক্তের স্বাদ অনুভূত হয় কিংবা রক্ত যদি থুথুর সমপরিমাণ বা বেশি হয়ে থাকে তাহলে তা গিলে ফেলার

দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে। এক্ষেত্রে ঐ রোজা কাযা করতে হবে। আর যদি থুথুর চেয়ে রক্তের পরিমাণ কম হয় এবং গলায় স্বাদও অনুভূত না হয় তাহলে রোজা ভাঙবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬

যেসব কারণে রোযা মাকরূহ হয়

এখনে মাকরূহ দ্বারা মাকরূহ তাহরীমী বোঝানো উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য, মাকরূহ কাজের ক্ষেত্রে এমন মানসিকতা ঠিক নয় যে, এটা করলেও তেমন কোনো অসুবিধা নেই। মাকরূহ তাহরীমীতে তো গুনাহ আছেই, মাকরূহ তানযিহীও বর্জনীয়। মাকরূহ তানযিহীর দ্বারাও ইবাদতের ফযীলত ও বরকত হ্রাস পায়। সুতরাং যে কোনো ইবাদত যাবতীয় মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থেকে আদায় করা উচিত।

মাসআলা: কুলি করার সময় গড়গড়া করা এবং নাকে পানি দেওয়ার সময় (ভিতরে পানি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এরূপ অসতর্কতার সাথে) উপরের দিকে পানি পৌঁছানো মাকরূহ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৮৮; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৭৯

মাসআলা: রোযা অবস্থায় বিনা ওজরে খাবার বা অন্য কিছু চিবানো কিংবা জিহ্বাতে লাগানো মাকরূহ। তবে একান্ত নিরুপায় হলে অনুমতি আছে। কিন্তু খাদ্য চিবানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন খাবারের কোনো অংশ বা স্বাদ গলায় চলে না যায়। কেননা গলায় স্বাদ বা কোন কিছু চলে গেলে রোযা ভেঙে যাবে। ইবরাহীম নাখয়ী রাহ. বলেন,

لا بأس أن تمضغ المرأة صبيها وهي صائمة ما لم تدخل حلقها

অর্থ: কোনো মহিলা তার সন্তানের জন্য রোযা অবস্থায় খাদ্য চিবিয়ে দিতে সমস্যা নেই; যদি খাদ্য গলায় চলে না যায়। -মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৯৩৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯;আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০০

মাসআলা: এমন কাজ করা মাকরূহ, যা দ্বারা রোযাদার নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, শিঙ্গা লাগানো। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৬

মাসআলা: রোযা রেখে বিবস্ত্র অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর আলিঙ্গন করা মাকরূহ। তবে কাপড় পরিহিত থাকলে এবং নিজের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলে মাকরূহ নয়। অবশ্য যদি এর দ্বারা কামভাব জাগ্রত হয় কিংবা মযী বের হয় তাহলে মাকরূহ হবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৭; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০০

মাসআলা: ইচ্ছাকৃত মুখে থুথু জমা করে তা গিলে ফেলা মাকরূহ। তবে জমা না করে এমনি থুথু বা লালা গিলে ফেলা মাকরূহ নয় এবং এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

মাসআলা: রোযা অবস্থায় গীবত করলে, গালি-গালাজ করলে, বে-পর্দা চললে, টিভি-সিনেমা দেখলে, গান-বাদ্য শ্রবণ করলে এবং যে কোনো বড় ধরনের গুনাহে লিপ্ত হলে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। আর এ কাজগুলো যে সর্বাবস্থায় হারাম, তা তো বলাই বাহুল্য।

হাদীসে কুদসীতে আছে- আল্লাহ তাআলা বলেন, إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب অর্থ: 'তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে তখন সে যেন অশালীন কথাবার্তা না বলে ও হৈচৈ না করে।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৪

মাসআলা: রোযা অবস্থায় এ পরিমাণ রক্ত দেওয়া মাকরূহ, যা দ্বারা শরীর অধিক দুর্বল হয়ে যায়। তবে যদি কেউ দুর্বলতা অনুভব না করে তাহলে তার জন্য রক্তদান মাকরূহ নয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯৪০; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/৩৭৯

মাসআলা: বিনা ওজরে গ্লুকোজ জাতীয় ইঞ্জেকশন (যা খাদ্যের কাজ দেয়) নেওয়া মাকরূহ।

মাসআলা : টুথ পাউডার, পেস্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা মাকরূহ। কিন্তু এগুলোর স্বাদ গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলে রোযা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাযা জরুরি হবে। তাই রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট বা মাজন ব্যবহার করবে না। টুথপেস্ট বা মাজন দিয়ে ব্রাশ করতে হলে সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আগেই করে নিবে। -ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৪১; জাওয়াহিরুল ফিকহ ৩/৫১৮

মাসআলা: রোযা অবস্থায় পান, গুল, জর্দা, তামাক ইত্যাদি মুখে রাখা মাকরূহ। তবে গলায় এগুলোর স্বাদ অনুভূত হলে রোযা ভেঙে যাবে। এক্ষেত্রে কাযা ও কাফফারা দু'টোই জরুরি।

মাসআলা: ইস্তিঞ্জার সময় পানি ব্যবহারে এত অতিরিক্ত করা মাকরূহ, যার দ্বারা পানি ভিতরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

মাসআলা: রোযাদার মহিলাদের লিপস্টিক বা লিপজেল ব্যবহার করা জায়েয। তবে রোযা অবস্থায় এগুলো ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ মুখে চলে গেলে রোযা মাকরূহ হয়ে যাবে। আর গলায় স্বাদ অনুভব হলে রোযা ভেঙে যাবে।

মাসআলা: রোজা অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনে দাঁত তোলা জায়েয। অতি প্রয়োজন ছাড়া মাকরূহ। আর মুখে লাগানো ওষুধ গলায় চলে গেলে কিংবা থুথু থেকে বেশি বা সমপরিমাণ রক্ত গলায় গেলে রোযা ভেঙে যাবে। -আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৩৬

মাসআলা: এমন কামভাব নিয়ে স্ত্রীকে চুম্বন করা মাকরূহ, যার দ্বারা মযী (বীর্যের আগে নির্গত তরল) বের হয়ে যায়।

মাসআলা: নিতম্ব পানিতে ডোবা অবস্থায় বায়ু ত্যাগ করা মাকরূহ। কারণ এতে ভিতরে পানি প্রবেশের আশঙ্কা থাকে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

যেসব কাজ রোযাদারের জন্য মাকরূহ নয়

মাসআলা: রোযাদারের জন্য কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া মাকরূহ নয়। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯

মাসআলা: শরীর শীতল করার জন্য গোসল করা মাকরূহ নয়। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

মাসআলা: রোযা অবস্থায় প্রয়োজনে জিহ্বা দ্বারা কোনো কিছুর স্বাদ নেওয়া বা প্রয়োজনে বাচ্চাদের খাদ্য চিবানো মাকরূহ নয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন খাবারের স্বাদ গলায় চলে না যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রোযা অবস্থায় সিরকা বা অন্য কিছুর স্বাদ

পরীক্ষা করতে সমস্যা নেই। যদি তা গলার ভেতর না যায়। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস: ৯৩৬৯; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৬

মাসআলা: রোযাদারের জন্য সুরমা লাগানো বা সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ নয়।-বাদায়েউস সানায়ে ২/২৬৮

মাসআলা: রোজা অবস্থায় টুথ পাউডার পেস্ট ইত্যাদি ছাড়া কাঁচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ নয়। এতে রোজার কোনো ক্ষতিও হয় না। বরং অন্য সময়ের মতো রোযা অবস্থাতেও মিসওয়াক করা সুন্নত। -রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯

হযরত আমের ইবনে রাবীয়া রাহ. বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা অবস্থায় অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি।-সহীহ বুখারী ১/২৫৯
রোজাদারের জন্য বিকেলে এমনকি ইফতারের পূর্বেও মিসওয়াক করা অন্য সময়ের মতোই সুন্নত। হাসান বসরী রাহ.কে রোযা অবস্থায় দিনের শেষে মিসওয়াক করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রোজা অবস্থায় দিনের শেষে মিসওয়াক করতে কোনো অসুবিধা নেই।

মিসওয়াক পবিত্রতার মাধ্যম। অতএব দিনের শুরুতে এবং শেষেও মিসওয়াক করো। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৪৮৯; মারাকিল ফালাহ ৩৭২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

মাসআলা: গাছের কাঁচা ডাল কিংবা পানিতে ভেজানো ডালের স্বাদ মুখে অনুভূত হলেও তা দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ নয়; বরং জায়েয। উরওয়া রাহ. রোযা অবস্থায় তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করে মিসওয়াকের সুন্নত আদায় করতেন। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৪৯১; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯২৬৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

যাদের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে

মুসাফির

মাসআলা: মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোজা না রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে বেশি কষ্ট না হলে রোজা রাখাই উত্তম। হযরত আসিম রাহ. বলেন, হযরত আনাস রা.কে সফরের হালতে রোজা রাখার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'মুসাফিরের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে। তবে রোজা রাখা উত্তম।'-মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হাদীস : ৯০৬৭

আর অস্বাভাবিক কষ্ট হলে রোজা রাখা মাকরূহ। এ অবস্থায় রোজা না রেখে পরে কাযা করে নিবে। -রদ্দুল মুহতার ২/৪২১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪০৩

মাসআলা: সফর শুরু করার আগে থেকে রোজা না রাখা বৈধ নয়। কেননা সফরের কারণে রোযা না রাখার সুযোগ তখন প্রযোজ্য হবে যখন দিনের শুরু অর্থাৎ সুবহে সাদিকের সময়ই মুসাফির থাকবে।- আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৯; ফাতহুল কাদির ২/২৮৮

তবে কখনো রোজা রাখা যদি অস্বাভাবিক কষ্টকর হয়ে যায় এবং পানাহার না করলে অসুস্থ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তখন রোজা ভাঙা জায়েজ।

এ হুকুমটি সকল রোজাদারের জন্যই প্রযোজ্য। হাসান বসরী রাহ. বলেন, যখন রমাযান মাসে কোন ব্যক্তি রোজা রাখে অতঃপর সফরের ইচ্ছায় বের হয় তবে সে যেন ওই দিন রোজা না ভাঙ্গে। অবশ্য তার যদি অধিক পিপাসার্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় তাহলে রোজা ভাঙ্গবে এবং পরে কাযা করে নিবে।-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস ৭৭৬৬; ফাতহুল কাদীর ২/২৮৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৬; রদ্দুল মুহতার ২/৪৩১

মাসআলা: যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় সাহরী খেয়ে সফর শুরু করেছে তার জন্য সফরের অজুহাতে রোজা ভাঙা জায়েয নয়। ভাঙলে গুনাহগার হবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৬

মাসআলা: সফর অবস্থায় রোজা রাখা শুরু করলে তা ভাঙা জায়েয নয়। ওযর ছাড়া কেউ ভেঙে ফেললে গুনাহগার হবে। তবে কাফফারা দিতে হবে না। শুধু কাযা করবে। - রদ্দুল মুহতার ২/৪৩১

মাসআলা: মুসাফির সফরের কারণে রোজা রাখেনি, কিন্তু দিন শেষ হওয়ার আগেই মুকীম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সেদিনের অবশিষ্ট সময় রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। আর পরবর্তীতে এ রোযার কাজা করে নিবে। হাসান বসরী রাহ. বলেন, যে মুসাফির রমযানের দিনে (সফরের হালতে) খানা খেয়েছে সে মুকীম হয়ে গেলে দিনের বাকি অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকবে। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/২২১,হাদীস: ৯৪৩৬-৯৪৩৮

অবশ্য দীর্ঘ অনাহারে থাকার কারণে যদি মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট হয় তাহলে খাবার খেতে পারবে। -কিতাবুল আছল ২/ ১৪৯; ফাতহুল কাদীর ২/২৮২

অসুস্থ ব্যক্তি

মাসআলা: রোজার কারণে যদি রোগ বৃদ্ধি পায় কিংবা আরোগ্য লাভে বিলম্ব হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় তাহলে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয। উল্লেখ্য যে, উক্ত আশঙ্কা যদি বাস্তবসম্মত ও প্রবল হয় তবেই রোজা ভাঙতে পারবে। নতুবা একজন অভিজ্ঞ দ্বীনদার চিকিৎসকের মতামত জরুরি হবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

গর্ভবতী

মাসআলা: রোজা রাখার কারণে গর্ভবতী মহিলার নিজের কিংবা সন্তানের প্রাণহানি বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানির প্রবল আশঙ্কা হলে তার জন্য রোজা ভঙ করা জায়েয। পরে এ রোজা কাযা করে নিবে। -আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯

দুগ্ধ দানকারিনী

মাসআলা: দুগ্ধ দানকারিনী মা রোজা রাখলে যদি সন্তান দুধ না পায় আর ঐ সন্তান অন্য কোনো খাবারেও অভ্যস্ত না হয়। ফলে দুধ না পাওয়ার কারণে সন্তানের মারাত্মক স্বাস্থ্যহানির

আশঙ্কা হয় তাহলে উক্ত মা রোজা ভাঙতে পারবে এ অবস্থায় তার জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে। এবং পরবর্তীতে এ রোজা কাযা করে নিবে।
-রদ্দুল মুহতার ২/৪২২

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن

الحامل والمرضع.

অর্থ: আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য রোজার হুকুম শিথিল করেছেন এবং আংশিক নামায কমিয়ে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধ দানকারিনীর জন্যও রোজার হুকুম শিথিল করেছেন।- জামে তিরমিযী ১/১৫২, হাদীস ৭১৫

দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি:

মাসআলা : বার্ধক্যজনিত কারণে রোজা রাখতে সক্ষম না হলে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে একজন গরীবকে দুই বেলা খাবার খাওয়াবে অথবা পৌনে দু কেজি গমের মূল্য সদকা করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

আর যাদের রোজা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর তারা ফিদইয়া একজন মিসকীনকে খাবার প্রদান করবে। —সূরা বাকারা (০২) : ১৮৪; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৬১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তির ফিদয়া আদায়ের সামর্থ না থাকলে

অপরদিকে সে এমন দরিদ্র ও অস্বচ্ছলও হয় যে, রোযার ফিদিয়া আদায় যদি কোন ব্যক্তি বার্ধক্যের কারণে রমযানের রোযা রাখতে অক্ষম হয় করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দরবারে ইস্তিগফার করবে। পরবর্তীতে কখনো কাযা করার কিংবা ফিদয়া আদায়ের সামর্থ্য ফিরে পেলে কাযা বা ফিদিয়া আদায় করে নিতে হবে।

-আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭

রমযান ও রোজার ক্ষেত্রে হায়েয-নেফাস সংশ্লিষ্ট মাসআলা

রমযানে ঋতুবতী মহিলার পানাহার

হায়েয-নেফাস অবস্থায় মহিলারা রমযান মাসের দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকবে না। তবে লোকচক্ষুর আড়ালে পানাহার করবে। রোযাদারের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। রোযাদারের মতো পানাহার না করাকে শরীয়তের বিধান মনে করলে গুনাহ হবে। -ফাতওয়া খানিয়া ১/২১৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২১৫

রোজা অবস্থায় হায়েয শুরু হলে

রমযান মাসে দিনের বেলায় হায়েয-নেফাস আরম্ভ হলে বাকী দিন পানাহার পনাহার করতে পারবে।

রমযানের দিনে হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হলে

রমযানের দিনে হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হলে অবশিষ্ট দিন রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকা অবশ্যক। তবে উক্ত ওজরে ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর সাথে এ দিনের রোযারও কাযা করবে। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/২২১, হাদীস ৯৪৩২; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪২৮; রদ্দুল মুহতার ১/২৫৩

স্রাব শুরু হতে পারে এজন্য রোজা ভাঙা

অভ্যাস অনুযায়ী দিনের যে কোনো সময় স্রাব শুরু হতে পারে এই আশঙ্কায় দিনের শুরু থেকে রোযা না রাখা বা রোযার নিয়ত থেকে বিরত থাকা জায়েয নেই। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২১৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

স্রাব শুরু হতে পারে এজন্য রোজা না রাখা

হায়েয আসতে পারে; এই আশঙ্কায় রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয নেই বরং এক্ষেত্রে বিধান হল স্রাব দেখে রোযা-নামায ছাড়বে। এমনকি কোন মহিলা যদি স্রাব আসতে পারে এই আশঙ্কায়

রোযা ভেঙে ফেলে অতঃপর সেদিন তার স্রাব না আসে। তাহলে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। তবে যদি সেদিন তার স্রাব আসে তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। -ফাতাওয়া খানিয়া ১/২০৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

ওষুধ সেবনের কারণে স্রাব বন্ধ থাকলে

ওষুধ সেবনের কারণে হলেও একজন মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ তার মাসিক স্রাব চালু না হবে ততক্ষণ তাকে নামায-রোযা করে যেতে হবে। আর এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু এটি কোনো উত্তম পন্থাও নয়। বিশেষ কোনো ওজর না থাকলে স্বাভাবিক নিয়মেই চলা উচিত। আর এ জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এ জাতীয় ওষুধ সেবনের কারণে কারও শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। -মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক হাদীস ১২১৯, ১২২০; আলমুহীতুল বুরহানী ১/৩৯৯; ফিকহুন নাওয়াযলি ২/৩০৮

নফল রোযা অবস্থায় স্রাব আরম্ভ হলে

নফল রোযা অবস্থায় মাসিক স্রাব আরম্ভ হলে পরবর্তীতে তার কাযা করে নিতে হবে। -আলমাবসূত, সারাখসী ৩/৯১; ফাতহুল কাদীর ২/২৮০

ফিদইয়া

মাসআলা : যে বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির রোযা রাখার সামর্থ্য নেই এবং পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে— এমন সম্ভাবনাও নেই, এমন ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া প্রদান করবে। —সূরা বাকারা (০২) : ১৮৪

ছাবেত আলবুনানী রাহ. বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা. যখন বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না তখন তিনি রোযা না রেখে (ফিদইয়া) খাবার দিতেন। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৫৭০

ইকরিমা রাহ. বলেন, আমার মা প্রচণ্ড তৃষ্ণা-রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে আমি তাউস রাহ.কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'প্রতিদিনের পরিবর্তে মিসকীনকে এক মুদ (বর্তমান হিসাবে পৌনে দুই কেজি) পরিমাণ গম দান করবে'। —মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৫৮১

মাসআলা : এক রোযার পরিবর্তে এক ফিদইয়া ফরয হয়। এক ফিদইয়া হল, কোনো মিসকীনকে দুই বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়ানো অথবা এর মূল্য প্রদান করা।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসায়্যিব রাহ. বলেন—

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.

(আর যাদের রোযা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর তারা ফিদইয়া—একজন মিসকীনকে খাবার প্রদান করবে।)

-এই আয়াত রোযা রাখতে অক্ষম বৃদ্ধের জন্য প্রযোজ্য। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৫৮৫; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৬৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৬

মাসআলা : যাদের জন্য রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়ার অনুমতি রয়েছে তারা রমযানের শুরুতেই পুরো মাসের ফিদইয়া দিয়ে দিতে পারবে। -আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭; আলবাহরুর রায়েক ২/২৮৭

মাসআলা : উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া (অর্থাৎ দুর্বল বৃদ্ধ ও এমন অসুস্থ ব্যক্তি, যার ভবিষ্যতে রোযার শক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) আরো যাদের জন্যে রোযা ভাঙা জায়েয আছে, (যেমন, মুসাফির, গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্যদানকারিণী) তারা রোযা না রাখলে রোযার ফিদইয়া দেবে না; বরং পরে কাযা করবে। আর ওযরের হালতে মৃত্যুবরণ করলে কাযা ও ফিদইয়া কিছুই ওয়াজিব হবে না। অবশ্য ওযরের হালত শেষ হওয়ার পর, অর্থাৎ মুসাফির মুকীম হওয়ার পর, গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া ও স্রাব বন্ধ হওয়ার পর এবং স্তন্যদানকারিণী স্তন্যদান বন্ধ করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে ওযর শেষে যে কয়দিন সময় পেয়েছে সে কয়দিনের কাযা যিম্মায় আসবে। কাযা না করলে উক্ত দিনগুলোর ফিদইয়া

প্রদানের ওসিয়ত করে যেতে হবে। —আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৩—৪২৪; কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ ১/২৫৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, গর্ভবতী নারী ও শিশুকে স্তন্যদানকারিণীর জন্যে রমযানে রোযা না রাখার অবকাশ রয়েছে। তারা ফিদইয়া আদায় করবে না; বরং রোযাগুলো কাযা করে নেবে। —মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭০৬৪

মাসআলা : ছুটে যাওয়া রোযার কাযা সম্ভব না হলে মৃত্যুর পূর্বে ফিদইয়া দেওয়ার ওসিয়ত করে যাওয়া জরুরি। ওসিয়ত না করে গেলে ওয়ারিশরা মৃতের পক্ষ থেকে ফিদইয়া দিয়ে দিলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। তবে মৃতব্যক্তি ওসিয়ত না করে গেলে সেক্ষেত্রে মিরাসের ইজমালী সম্পদ থেকে ফিদইয়া দেওয়া হবে না। একান্ত দিতে চাইলে বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের অংশ থেকে দিতে পারবে। —রদ্দুল মুহতার ২/৪২৪-—৪২৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

মাসআলা : এক রোযার ফিদইয়া একজন মিসকীনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দিলেও ফিদইয়া আদায় হয়ে যাবে। একাধিক ফিদইয়া এক মিসকীনকে দেওয়া জায়েয।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে বৃদ্ধ রোযা রাখতে সক্ষম নন তিনি রোযা না রেখে প্রতি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আধা সা (অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি) গম দিয়ে দেবেন। -মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৫৭৪; আলবাহরুর রায়েক ২/৮৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭

রোজার আধুনিক মাসায়েল

রমযানে দেশ পরিবর্তনের কারণে রোযা কম-বেশী হলে

মাসআলা: রমযানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফরের কারণে কোনো ব্যক্তির রোযা যদি ২৭ বা ২৮টি হয়ে যায় অর্থাৎ ২৭/২৮টি রোযা রাখার পর যে দেশে গেছে সে দেশে ঈদের চাঁদ উদিত হয়ে যায় তাহলে তার কর্তব্য হল, ঐ দেশের লোকদের মতো সেও রোযা ছেড়ে দিবে এবং সকলের সাথে ঈদ করবে। পরবর্তীতে আরো দুই বা একটি রোযা কাযা করে ২৯ রোযা পূর্ণ করে নিবে। -ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২১৫; ফাতাওয়া লাজনাতিদ দাইমা ১০/১২৭

মাসআলা: তদ্রূপ এক দেশ থেকে আরেক দেশে সফরের কারণে কারো রোযা যদি ৩০টির বেশি হয়ে যায় যেমন-কেউ রমযানের শুরুতে সৌদি ছিল। সেখানে বাংলাদেশের এক/দুই দিন আগেই রোযা শুরু হয়েছে। এরপর শেষের দিকে বাংলাদেশে এল। তার রোযা ৩০টি হলেও বাংলাদেশে ঈদের চাঁদ দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে তার কর্তব্য হল, রমযানের সম্মানার্থে রোযা রাখা এবং এদেশের লোকদের সাথে একত্রে ঈদ করা। -ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/২১৫; ফাতাওয়া লাজনাতিদ দাইমা ১০/১২৭

বিমানের যাত্রীগণ কখন ইফতার করবে?

মাসআলা: বিমানের যাত্রীগণ নিজেরা যখন সূর্যাস্ত হতে দেখবে তখনই ইফতার করবে। সুতরাং বিমানের ভেতেরে আকাশে থেকে জমিনের সময় অনুযায়ী ইফতার করা যাবে না এবং যে এলাকার আকাশের উপর বিমান থাকবে সেখানের স্থলভাগের হিসেবেও ইফতার করা যাবে না। এক্ষেত্রে যদি রোযা ২০-২২ ঘণ্টারও বেশি হয়ে যায় তবু সূর্যাস্ত না দেখে ইফতার করা যাবে না। তবে হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত অবস্থায় রোযা পুরা করতে গেলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাহলে সে রোযা ভেঙে ফেলতে পারবে এবং পরবর্তীতে এ রোযা কাযা করে নিবে।- রদ্দুল মুহতার ২/৪২০

মাসআলা: রোযা অবস্থায় বিমানে পশ্চিম দিকে সফর করার কারণে দিন যদি বড় হয়ে যায় তাহলেও (বিমানে বা জমিনে যেখানেই থাকবে সেখানের তার অবস্থানস্থলে) যখন সূর্যাস্ত হবে তখনই তার ইফতারের সময় হবে। এর আগে ইফতার করা বৈধ হবে না। অবশ্য দিন বেশি

বড় হয়ে যাওয়ার কারণে রোযা রাখা যদি অনেক বেশি কষ্টকর হয়ে যায় তাহলে তার জন্য রোযা ভেঙে ফেলার অনুমতি আছে। তবে পরবর্তীতে এ রোযাটি কাযা করে নিতে হবে।

যেসব এলাকায় দিন অনেক বড় হয়

মাসআলা:

যেসব দেশে দিন ১৬/১৭ ঘণ্টা অথবা তার চেয়েও বড় সেসব দেশেও সূর্যাস্ত পর্যন্তই রোযার সময়। সূর্যাস্তের আগে ইফতার করা জায়েয হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থ: অত:পর তেমারা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭) তবে হ্যাঁ, দিন অস্বাভাবিক লম্বা হওয়ার কারণে রোযা রাখার কারণে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা খুব বেশি কষ্ট হয়ে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা জায়েয। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে এ রোযার কাযা করে নিতে হবে। -ফিকহুল নাওয়াযিল ২/১৫২

যেখানে সূর্যাস্তের পরই সূর্য উঠে যায় বা সূর্য অস্তমিত হয় না

মাসআলা: যেসব এলাকায় সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আবার সূর্য উদয় হয়ে যায় বা যেখানে অনেক দিন সূর্য উদয় হয় না কিংবা অস্ত না যায় সেসব এলাকার মুসলমানদের উপরও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। এসব এলাকায় নামায-রোযার সময় নির্ধারণের জন্য করণীয় হল, সবচেয়ে নিকটবর্তী যে এলাকায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পাওয়া যায় সে এলাকার সময়ের সাথে মিলিয়ে নামায-রোযা আদায় করা। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/ ১৫৪

রোজা অবস্থায় কানে তেল, ড্রপ ইত্যাদি ব্যবহার করা

মাসআলা: রোযা অবস্থায় কানের ভিতর তেল, ড্রপ বা অন্য কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যাবে। এর দ্বারা রোযা ভাঙবে না। তদ্রূপ কানের ভিতর পানি চলে গেলেও রোযা ভাঙবে না। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহ, দশম সংখ্যা ২/৪৪৪, ৩৬৫

নাকে ড্রপ, স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার

মাসআলা: নাকে ড্রপ,স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহারের পর তা যদি গলার ভিতরে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য গলায় না গেলে বা স্বাদ অনুভূত না হলে রোযা ভাঙবে না। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৪৫৪; আলমওসুআতুত তিব্বিয়্যা আলফিকহিয়্যাহ ৬২৪

রোজা অবস্থায় অক্সিজেন নেওয়া

মাসআলা: অক্সিজেন নিলে রোজা ভাঙবে না। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

রোজা অবস্থায় ইঞ্জেকশন নেওয়া

মাসআলা: গ্লুকোজ জাতীয় ইঞ্জেকশন অর্থাৎ যে সকল স্যালাইন ও ইঞ্জেকশন খাদ্যের কাজ দেয় তা রোযা অবস্থায় মারাত্মক অসুস্থতা ছাড়া নেওয়া নাজায়েয। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০; আলাতে জাদীদা কে শরয়ী আহকাম ১৫৩

মস্তিষ্কে ওষুধ ব্যবহার করা

মাসআলা: মস্তিষ্কে অপারেশনের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভিতর কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। তেমনি মাথার কোনো ক্ষতে ওষুধ লাগানোর ফলে তা মস্তিষ্কের ভিতর চলে গেলেও রোযা ভাঙ্গবে না। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহ, দশম সংখ্যা ২/৩৬৫, ৪৫৪; যাবিতুল মুফাতিরাত ৫৭

রক্ত দেয়া ও নেয়া:

মাসআলা: রক্ত দিলে অথবা নিলে কোন অবস্থাতেই রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত দিলে তো কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢোকেনি, তাই। এতে রোজা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্ন আসে না। আর রক্ত নিলে যদিও তা দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিন্তু তা রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গায় প্রবেশ করে না। তেমনিভাবে গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না বিধায়

এতে রোজা ভঙ্গ হবে না।(ইবনে আবিদিন, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৪০০;আল-কাসানি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৯২;ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ২০০)

সালবুটামোল (SALBUTAMOL), ইনহেলার (INHALER) ব্যবহার:

মাসআলা: সালবুটামোল,ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের ভিতর স্প্রে করা হয়।। এতে যে জায়গায় শ্বাসরুদ্ধ হয় ওই জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে আর কোনো কষ্ট থাকে না। ওষুধটি যে। শিশিতে যে পরিমাণে থাকে ঐ শিশির মুখ একবার টিপলে শিশির আকার ভেদে ঐ পরিমানের একশত কিংবা দুইশত ভাগের এক ভাগ বেরিয়ে আসে। অতি স্বল্প পরিমাণে গ্যাসের ন্যায় বের হবার কারণে কেউ ওষুধটিকে বাতাস জাতীয় মনে করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এমন নয় বরং ওষুধটি দেহবিশিষ্ট। কাঠ ইত্যাদি কোন বস্তুতে স্প্রে করলে দেখা যায় যে, ঐ বস্তুটি ভিজে গেছে। তাই এতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে।
অনেককে বলতে শোনা যায় যে, 'ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে রোজা ভঙ্গ হবে না।' কথাটি একেবারেই হাস্যকর। কেননা, কেহ যদি ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অতি প্রয়োজনীয় কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে কি অতি প্রয়োজনে খাওয়ার কারণে তার রোযা ভঙ্গ হবে না? অবশ্যই হবে। অতি প্রয়োজনের সময় রোজা ভাঙলে পরবর্তীতে কাযা করা ও এতে গুনাহ না হওয়া ভিন্ন কথা। আর রোজা ভঙ্গ না হওয়া ভিন্ন কথা।
হ্যাঁ, যদি মুখে ইনহেলার স্প্রে করার পর না গিলে থুতু দিয়ে তা বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। এভাবে কাজ চললে তো বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি রোজাও ভঙ্গ হলো না।(ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা পৃষ্ঠা: ৩২৪ মাজাল্লাতু মাজমাআইল ফিকহিল ইসলামি, খণ্ড-১০ ভলিউম- ২. পৃষ্ঠা: ৩১-৬৫)

রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহারের নিয়ম:

মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক বলেন: সাহারীতে এক ডোজ ইনহেলার নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত আর ইনহেলার নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার ব্যবহার করে রোজা রাখা চাই। হ্যাঁ, যদি কারো বক্ষব্যাধি এমন জটিল ও মারাত্মক। আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে শরীয়াতে এই সুযোগ। রয়েছে যে, তারা প্রয়োজন ভেদে ইনহেলার ব্যবহার করবে ও

পরবর্তীতে রোজার কাজা করে নিবে। আর কাজা সম্ভব না হলে ফিদিইয়া আদায় করবে।(ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা,৩২৪)

নাইট্রোগ্লিসারিন

মাসআলা: এ্যারোসল জাতীয় এ ঔষধটি হার্টের রোগীরা ব্যবহার করেন। ডাক্তারের মতে ওষুধটি জিহ্বার নিচে ২/৩ ফোটা দেওয়ার পর সাথে সাথে শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। এ হিসাবে এ ওষুধ ব্যবহার করার পর গলাতে ঔষধ না গেলে বা এর স্বাদ না পৌঁছলে রোজা ভাঙবে না। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/২৯৯

এন্ডোসকপি

মাসআলা: এ পরীক্ষার সময় টিউবের সাহায্যে পাকস্থলিতে পানি বা ওষুধ ইত্যাদি কোনো কিছু যদি দেওয়া না হয় তাহলে এন্ডোসকপির কারণে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি টিউবের সাথে বা এর সাহায্যে ভিতবে কোনো ওষুধ, পানি বা অন্য কিছু যে ডাক্তার পরীক্ষা করবেন তার থেকে জেনে নিতে হবে যে, টিউবের দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভেঙে যাবে। তাই সাথে বা এর সাহায্যে ভিতরে কোনো কিছু দেওয়া হয়েছে কি না। আল মুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৮; আদ্দুররুল মুখতার; ২/৩৯৭ মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৪৫৫, ৪৬৫; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

এমনিভাবে ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে লেখা আছে, ‘যদি কেউ কোনো গোশতের টুকরা সুতা দ্বারা বেঁধে গিলে ফেলে অতঃপর টান দিয়ে বের করে নিয়ে আসে তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না।’ -ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ২/২০৪

প্রকাশ থাকে যে, রমযানে এন্ডোসকপি করার প্রয়োজন হলে ইফতারের পর করার চেষ্টা করবে।

এনজিওগ্রাম

মাসআলা: এনজিওগ্রাম করলে রোযা নষ্ট হয় না। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/২৯৮

পেশাবের রাস্তায় ক্যাথেটার বা অন্য কোন ওষুধ ব্যবহার

মাসআলা: পুরুষ বা মহিলাদের পেশাবের রাস্তায় কোনো ধরনের ওষুধ বা ক্যাথে টার বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোনো যন্ত্র ইত্যাদি প্রবেশ করালে রোযা ভাঙ্গবে না। তদ্রূপ এখানে কোনো ওষুধ দিলেও রোযার ক্ষতি হবে না। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৩৬৫, ৪৫৪;যাবিতুল মুফাততিরাত ১৭৬; ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

সাপোজিটর ব্যবহার

মাসআলা: মলদ্বার দিয়ে কোনো ওষুধ ভিতরে প্রবেশ করালে রোযা ভেঙে যাবে। যেমন জ্বর বা ব্যথার কারণে ঢুশ বা সাপোজিটর ব্যবহার করা। -মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দশম সংখ্যা ২/৩৪৪;

ডায়ালাইসিস

মাসআলা: রোজা অবস্থায় রক্ত দেওয়া-নেওয়া দু'টোই জায়েয। এর কারণে রোজা ভাঙ্গবে না। তাই ডায়ালাইসিসের কারণে রোজা ভাঙবে না। তবে রক্ত দেওয়ার কারণে অধিক দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে রোজা অবস্থায় রক্তদান মাকরূহ। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/৩০০

মুখে ঔষধ ব্যবহার

মাসআলা: মুখে কোন ঔষধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে রোজা ভেঙ্গে যাবে।চাই তা যতই অল্প হোক। ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, পৃষ্ঠা:২৫৫

নকল দাঁত মুখে রাখা

মাসআলা: রোজা রেখে নকল দাঁত মুখে স্থাপন করে রাখলে রোজার কোন ক্ষতি হয় না। (ইমদাদুল ফতওয়া)

স্যালাইন (SALINE)

মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ স্যালাইন নেয়া হয় রগে। আর রগ রোজা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য ছিদ্র ও রাস্তা নয়। তবে রোজার দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে স্যালাইন নেয়া মাকরূহ্।আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ২৮৮

ইনসুলিন (INSULINE)

মাসআলা: ইনসুলিন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ ইনসুলিন রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে না এবং গ্রহনীণযোগ্য খালি জায়গায়ও পৌঁছে না।(ইবনে আবিদিন, খ. ৩, পৃ. ৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭)

পেশাবের রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার (URINARY TRACT)

মাসআলা: পেশাবের রাস্তায় ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ পেশাবের রাস্তা রোজা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তেমনি ভাবে পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন বস্তু ভেতরে প্রবেশ করলে তা মুত্রথলীতে পৌঁছে মাত্র আর মুত্রথলী রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা নয়।(আল মালাকাতুল ফিকহিয়্যা ১/১১৪-১১৫)

যোনিদ্বারে ওষুধ ব্যবহার (VAGINA)

মাসআলা: যোনিদ্বারে ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ যোনিদ্বার রোযা ভঙ্গ হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তেমনি ভাবে যোনিদ্বার দিয়ে কোন বস্তু ভেতরে প্রবেশ করলে তা এমনকোন খালি জায়গায় ঢুকে না, যেখানে ঢুকলে রোজা ভঙ্গ হয়। বরং জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে ঢুকে আর গর্ভাশয় রোজা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য খালি জায়গা নয়।(আল মালাকাতুল ফিকহিয়্যা ১/১১৪-১১৫)

নাইট্রোগ্লিসারিন

এ্যারোসল জাতীয় এ ওষুধটি হার্টের রোগীরা ব্যবহার করেন। ডাক্তারের মতে ওষুধটি জিহ্বার নিচে ২/৩ ফোটা দেওয়ার পর সাথে সাথে শিরার মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায়। এ হিসাবে এ ওষুধ ব্যবহার করার পর গলাতে ওষুধ না গেলে বা এর স্বাদ না পৌঁছলে রোযা ভাঙবে না। -ফিকহুন নাওয়াযিল ২/২৯৯

এম আর (M.R)

মাসআলা: এম আর হল গর্ভ ধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে জরায়ুতে এম আর সিরিঞ্জ প্রবেশ করিয়ে জীবিত কিংবা মৃত ভ্রূণ নিয়ে আসা। যার পর ঋতুস্রাব পুণরায় হয়। অতএব মাসিক শুরু হওয়ার কারণে রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। কিন্তু যদি রাতের বেলা করা হয় তাহলে দিনের রোজা কাযা করতে হবে না। (ফতহুল কাদীর)

দাঁত তোলা

মাসআলা: রোজা অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন হলে দাঁত তোলা জায়েজ আছে। তবে অতি প্রয়োজন না হলে এমনটা করা মাকরূহ। ঔষধ যদি গলায় চলে যায় অথবা থুথু থেকে বেশি অথবা সমপরিমাণ রক্ত যদি গলায় যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। (আহসানুল ফতওয়া)

এনজিওগ্রাম

মাসআলা: হার্ট ব্লক হয়ে গেলে উরুর গোড়া দিয়ে কেটে বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে হার্ট পর্যন্ত যে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হয় তার নাম এনজিওগ্রাম। এ যন্ত্রটিতে যদি কোনো ধরনের ঔষধ লাগানো থাকে তারপরেও রোজা নষ্ট হবে না। -ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা

বায়োপসি (BIOPSY)

পেট ছিদ্র করে সিক জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য বের করে আনা হয়। এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কারণ রোযা ভঙ্গ

হওয়ার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু ভেতরে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করা ও প্রবেশের সাথে সাথে বের না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে থাকলে ঐ বস্তু বা তার অংশবিশেষ হজম হয়ে যায়। এখানে এর কোনটিই পাওয়া যায়নি। তবে সিকের মধ্যে কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে এবং তা গলদ্বার থেকে নিয়ে মলদ্বার পর্যন্ত নাড়িভুঁড়ির যে কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা, পৃষ্ঠা:২৬১

লেপারোস্কপি

একটি টিউব দ্বারা পেট ছিদ্র করে পেটের ভিতরের কোনো অংশ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করে নিয়ে আসা হয়। এতে যদি ঔষধ লাগানো থাকে তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে অন্যথায় রোজা ঠিক থাকবে। -আল মাকালাতুল ফিকহিয়া

রক্ত দেয়া

রোজা অবস্থায় ব্লাড টেস্টের জন্য বা কোনো রুগীর জন্য শরীর থেকে রক্ত দিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। তবে রক্ত দেওয়ার কারণে যদি এমন দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকে যে, সে রোজা রাখতে পারবে না, তাহলে মাকরুহ হবে। -ফাতহুল ক্বদির: ২/৩৪৬, আহসানুল ফতোয়া: ৪/৪২৫, জাওয়াহিরুল ফিক্বাহ: ১/৩৭৯, মাসায়েলে রোজা: ৭০

আলট্রাসনোগ্রাম

মাসআলা: আলট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষায় যে ঔষধ বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সবই চামড়ার উপরে থাকে, তাই আলট্রাসনোগ্রাম করলে রোজা ভাঙ্গবে না। (হেদায়া)

সিস্টোসকপি

মাসআলা: প্রসাবের রাস্তা দিয়ে ক্যাথেটার প্রবেশ করিয়ে যে পরীক্ষা করা হয় এর দ্বারা রোজা ভাঙ্গবে না। -হেদায়া

প্রক্টোসকপি

পাইলস, অর্শ ও ফিস্টুলা ইত্যাদি রোগের পরীক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। মলদ্বার দিয়ে নল প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষাটি করা হয়। রোগী যাতে ব্যথা না পায় সে জন্য নলের মধ্যে গ্লিসারিন জাতীয় কোনো পিচ্ছল বস্তু ব্যবহার করা হয়। নলটি পুরোপুরী ভিতরে প্রবেশ করে না। চিকিৎসকদের মতানুসারে ওই পিচ্ছিল বস্তুটি নলের সঙ্গে মিশে থাকে এবং নলের সঙ্গেই বেরিয়ে আসে, ভেতরে থাকে না। আর থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে আসে। যদিও শরীর তা চোষে না কিন্তু ওই বস্তুটি ভিজা হওয়ার কারণে রোজা ভেঙ্গে যাবে। -ফতোয়ায়ে শামী: ২/১০৮, ফাতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ: ৬/৪১১

সুগার মাপা

মাসআলা : ডায়াবেটিস পরীক্ষার জন্য যে রক্ত নেওয়া হয়, এটিও রোযা ভঙ্গের কারণ নয়। –কিতাবুল আছল ২/১৪৬; শরহু মুখতাসারিত তাহাবী ২/৪৩৭; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬

প্যাথলজি পরীক্ষা ও টেস্টের নমুনা সংগ্রহ

মাসআলা : বিভিন্ন প্যাথলজি পরীক্ষা ও টেস্টের জন্য রক্ত পেশাব ও শ্লেষ্মা বা এজাতীয় নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এসবের কারণে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। শরীর থেকে কোনো কিছু বের হলে বা বের করা হলে এ কারণে রোজার কোনো ক্ষতি হয় না। –কিতাবুল আছল ২/১৪৬; শরহু মুখতাসারিত তাহাবী ২/৪৩৭; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬; মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী ১০/২/৪৬৫

টিকা নেওয়া

মাসআলা : যেসব টিকা ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় পুশ করে গ্রহণ করা হয়, এসবের দ্বারা রোজা ভাঙে না। তাই রোযা অবস্থায় এ ধরনের টিকা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। –ফাতহুল কাদীর ২/২৫৭; যাবিতুল মুফাত্তিরাত পৃ. ৬৯; জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৬৯; মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী ১০/২/৪৫৪

তবে যেসব টিকা মুখে ব্যবহার করা হয় এবং তা গলার ভেতর চলে যায়, তা দ্বারা রোজা ভেঙে যাবে। তাই রোজা অবস্থায় এ ধরনের টিকা নেওয়া যাবে না।
২/৩৪৪; যাবিতুল মুফাত্তিরাত, পৃ. ১৭৪

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি রোজা ইসলামের একটি অপরিহার্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত। এটি কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য এবং খোদাভীতি বা তাকওয়ার গুণাবলি সৃষ্টি করা। রোজার মাধ্যমে একজন মুসলিম দীর্ঘ এক মাস ধরে আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর প্রশিক্ষণ লাভ করে। এই প্রশিক্ষণের ফলে তার চরিত্র সভ্য ও আদর্শভিত্তিক হয়ে ওঠে।রোজা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিশুদ্ধ করে এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

সর্বোপরি, রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম এবং এর প্রতিটি মাসআলা-মাসায়েল বিজ্ঞানসম্মত ও কল্যাণকর। এই বিধানগুলো যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই একজন মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করতে পারে।

তথ্যসূত্র

-আল কুরআন
-বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থ
-উইকিপেডিয়া
-ইসলামিক ওয়েবসাইট
-রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল
-সিয়াম ও রমজান: শিক্ষা-তাৎপর্য-মাসাইল
-মাসিক আলকাউসার
-Islamic Online Madrasah(IOM) class note
-ResearchGate
-PubMed Central (NIH)